তুরস্কের গল্প গাথা



তুরস্কের গল্প গাথা

রবীন্দ্রনাথ দস্তিদার

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৮৯। প্রকাশক ঃ জয়দেব ঘোষ মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। প্রচ্ছদ ঃ সত্য চক্রবর্তী। মুদ্রাকর ঃ বাবাই-পাপাই প্রেস ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩।

মূল্য ঃ ১০·০০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

আমার দুষ্টু-মিষ্টি নাতনী

সোনাকে

—দাদু

২৫.১.৮৯

গল্পের সূচনা

অনেক দিন আগে তুরস্ক দেশে হাসাকিন নামে এক বিশ্রুতকীর্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশা রাজত্ব করতেন। তাঁর শৌর্যবীর্য আর রণনৈপুণ্যে অস্থির হয়ে আশেপাশের অন্যান্য রাজারা তাঁকে একবাক্যে নিজেদের সম্রাট বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর রাজোচিত বিভিন্ন গুণাবলীর জন্য প্রজারাও বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করত হাসাকিনকে।

হাসাকিনের একমাত্র পুত্র নূরও ছিলেন অবিকল পিতার মত। রূপবান, গুণবান ও বীর্যবান। তাঁর সুখ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মনোমত পুত্র এবং সতী-সাধ্বী পত্নী নিয়ে সুখেই দিন কাটছিল সম্রাট হাসাকিনের। একদিন কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত তাঁর সুখের সংসারে দুঃখের ছায়া নেমে এলো। সামান্য তিন দিনের অসুস্থতায় সম্রাট মহিষী হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন।

প্রিয়তমা পত্নীর বিরহে অন্ন-জল প্রায় ত্যাগ করলেন বাদশা। রাজ-কার্যে তাঁর আর মন রইল না। অমাত্যরা তাঁকে অনেকভাবে বোঝালেন, সান্ত্বনা দিলেন কিন্তু সবই ভস্মে ঘৃতাঞ্জলি প্রদানের মত নিষ্ফলা হলো।

বাদশা হাসাকিন এই রকম শোক-সন্তাপে কিছুদিন অতিবাহিত করলেন বটে, কিন্তু ইহজগতে কিছুই যখন চিরস্থায়ী নয় তখন মানুষের মনের শোকও চিরস্থায়ী হতে পারে না। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাদশার মনেরও পরিবর্তন ঘটতে লাগল ধীরে ধীরে। সুযোগ বুঝে অমাত্যরা তাঁকে আবার বিবাহ করার জন্য পরামর্শ দিতে লাগলেন। এবার আর তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো না। সম্রাট সামান্য ইতস্ততঃ করে অবশেষে দ্বিতীয় বার বিবাহে রাজী হয়ে গেলেন।

বাদশার বয়স যাই হোক, তাঁর মত সুযোগ্য পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে কেই বা অরাজী থাকে? সুতরাং পাত্রীর অভাব ঘটল না। খাদিজা নামে এক পরম রূপবতী রাজকন্যার সঙ্গে বাদশা হাসাকিনের বিবাহ হয়ে গেল সমারোহে।

খাদিজা ছিলেন অসাধারণ বাক্‌পটু, চতুর এবং বুদ্ধিমতী রমণী; ফলে অচিরেই তিনি বাদশাকে নিজের বশীভূত করে ফেললেন। খাদিজাকে তিলেক না দেখতে পেলে বাদশা জগৎ সংসার অন্ধকার দেখতেন।

প্রকৃতপক্ষে খাদিজা কিন্তু স্বামীকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতে পারেননি। তিনি চাইতেন কিভাবে তাঁকে নিজের অনুগত করে যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারিণী হওয়া যায়—সিংহাসন দখল করা যায়।

স্বামীর ভয়ে প্রকাশ্যে কোনও তৎপরতা দেখালেন না। তবে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন নিজের অভিপ্রায় হাসিল করবার।

বাদশাজাদা নুর ছিলেন খুবই জ্ঞানপিপাসু যুবক। সাহিত্য দর্শন, কাব্য, নাটক, অঙ্কন প্রভৃতি বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তবু নূতন নূতন বিষয় শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ কিছুমাত্র কম ছিল না। সম্প্রতি তিনি আবু মাস্কার নামে একজন দেশ বিখ্যাত জোতির্বেত্তার কাছে জ্যোতিষ-বিদ্যার পাঠ নিচ্ছিলেন।

একদিন খানিকটা নিজের খেয়ালে আবার খানিকটা বাদশাজাদার অনুরোধে আবু মাস্কার নূরের ভাগ্যগণনা করতে গিয়ে তাঁর আশু বিপদের কথা জানতে পেরে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বাদশা-জাদাকে ডেকে তিনি বললেন, 'বৎস, আমি তোমার ভাগ্যগণনা করে দেখলাম শীঘ্রই তোমার এমন এক বিপদ ঘটবে যার ফলে তোমার জীবন সংশয়ও হতে পারে। অতএব অতি সত্বর এর প্রতিবিধান করা কর্তব্য।'

আবু মাস্কারের কথায় নূরের বীর হৃদয়ও ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠল। তিনি পাংশুমুখে নীরবে বসে রইলেন গুরুর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে।

আবু মাস্কার তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বৎস, তুমি কাতর

হয়ো না। আমি দীর্ঘদিন ধরে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করে আসছি। অশান্ত ও কুপিত গ্রহ-নক্ষত্রদের কিভাবে শান্ত করতে হয়, তাদের রুষ্ট ও অশুভ প্রভাব কিভাবে মোলায়ম করতে হয়, তা কিছু কিছু জানি। আমি তোমাকে একটি মন্ত্রপূতঃ তাবিজ দিচ্ছি, তুমি সেটি তোমার বাম বাহুতে আগামী দিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ধারণ করে যদি চল্লিশ দিন মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকতে পার, তাহলে নিশ্চয় তোমার বিপদ দূর হবে। অন্যথায় তোমার জীবননাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।'

গুরুর কথায় তাবিজ ধারণ করে, চল্লিশ দিন মৌনব্রত অবলম্বনে কৃতসংকল্প হলেন নূর। তিনি পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নানাদি শেষ করে গুরুর দেওয়া মন্ত্রপূতঃ তাবিজ ধারণ করে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধির মানসে রাজ্যের উপান্তে অবস্থিত একটি পর্বত-কন্দরে প্রবিষ্ট হয়ে মৌনব্রত পালনে উদ্যোগী হলেন। কাউকে কোন কথা জানালেন না।

কয়েকদিন যাবৎ পুত্রকে না দেখতে পেয়ে তিনি প্রথমে কৌতূহলী পরে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। নূরের অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠালেন। লোকেরা বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে তাঁকে এনে হাজির করল বাদশার সামনে।

বাদশা হাস্যাকিন পুত্রকে তাঁর এই নির্জন পর্বত কন্দরে নির্বাসিতের মত জীবন-যাপনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু নূর কোনও উত্তর না করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিস্মিত বাদশা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুত্র, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোন অশুভ শক্তি কি তোমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ করে দিয়েছে? নাকি, তুমি কোন কারণে রুষ্ট

হয়েছ আমার উপর ?'

কিন্তু তাঁর সব প্রচেষ্টাই বিফলে গেল। নূর একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও। সভাসদরাও ব্যর্থ হলেন বাদশাজাদাকে দিয়ে কথা বলাতে।

বাদশা তখন নিরুপায় হয়ে একজন রাজকর্মচারীকে ডেকে বললেন, 'পুরোরক্ষী। বাদশাজাদা বোধহয় কোন গোপনীয় কারণবশতঃ তাঁর দুঃখের কথা আমাদের জানাচ্ছেন না। তুমি ওঁকে অন্তঃপুরে ওঁর মায়ের কাছে নিয়ে যাও। হয়তো তাঁর কাছে বাদশাজাদা তাঁর নীরবতার কারণ ব্যক্ত করতে পারেন।'

পুরোরক্ষী বাদশার আদেশ মত বাদাশাজাদাকে অন্তঃপুরে পেঁছে দিলে।

পুরোরক্ষীর মুখে বাদশার অভিপ্রায় জানতে পেরে খাদিজার মন আনন্দে নেচে উঠল, পাপীয়সী রমণী মনে মনে ভাবলেন, এইবার আমার স্বার্থ-সিদ্ধির বিলক্ষণ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহ্ বুঝি এতদিন পরে আমার ওপর সদয় হলেন। আমি এবার নির্বিঘ্নে আমার মনের অভিলাষ বাদশাজাদার কাছে প্রকাশ করতে পারব। যদি বাদশাজাদা সত্যি সত্যি বোবা হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে আমার অভিলাষ পূরণে তাঁর বাসনা না থাকলেও সে কথা তিনি বাদশার কাছে ব্যক্ত করতে পারবেন না। আর যদি মুখে না বলে লিখে জানান তবে আমি বলব—বাদশাজাদাকে কথা কওয়াবার জন্যেই আমি ওই ধরনের ছলনার আশ্রয় নিয়ে-ছিলাম। সুতরাং আমার আর বিপদ কি।

এই সব চিন্তা করে খাদিজা নিজের মহল থেকে তাঁর সহচরীদের দূরে সরিয়ে দিয়ে শুধু বাদশাজাদা নূরকে নিয়ে একা রইলেন।

অতঃপর কুচক্রী রমণী ইনিয়ে-বিনিয়ে নূরকে নিজের মনের অসৎ বাসনার কথা জানালেন। এবং এও জানালেন যে, রাজ্য, ঐশ্বর্য সমস্তই তাঁর হস্তগত। নূর যদি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত থাকেন তবে বৃদ্ধ বাদশাকে এক মুহূর্তে সিংহাসনচ্যুত করে সেই সিংহাসনে তিনি বাদশাজাদাকে বসিয়ে দেবেন। তখন শুধু এই সমগ্র তুরস্ক দেশই নয় সেই সঙ্গে স্বয়ং খাদিজার পিতৃরাজ্যও তাঁর অধীনস্থ হয়ে থাকবে।

নূর বিমাতার এই ধরনের সাংঘাতিক প্রস্তাব শুনে একেবারে বিস্ময় সাগরে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

খাদিজা তাঁর এই বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থা দেখে ভুল বুঝলেন ভাবলেন, নূর বোধহয় তিনি কেমন করে এই অসাধ্য কাজ সাধন করবেন, তাই ভেবে অবাক হচ্ছেন। খাদিজা তাই সহাস্যে বললেন, 'অবাক হওয়ার কিছু নেই, বাদশাজাদা। তোমার ইঙ্গিত আর সম্মতি পেলে আমি আজই তার ব্যবস্থা করতে পারি। আমার কাছে অনেক রকম বিষাক্ত দ্রব্য আছে। তার যে কোন একটি তোমার পিতাকে ভক্ষণ করালে এক মাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। তিনি ঐ বিষ গ্রহণ করলে অচিরেই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয়ে কৃশ আর দুর্বল হতে হতে একদিন জীবন শেষ করে বসবেন। কেউ কোন সন্দেহই করতে পারবে না যে এই মৃত্যু তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।'

বিমূঢ় আর ভীত নূরের মুখে একই সঙ্গে ফুটে উঠল। ঘৃণা-বিস্ময় আর ক্রোধ।

খাদিজা আরও বলতে লাগলেন, 'সুতরাং কেউই তোমার কোন নিন্দা করতে পারবে না। আমরা তখন রাজ্য ও অতুল

ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারব।'
নুর আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। তিনি গুণ ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন আর বিমাতার গালে সবলে এক চপেটাঘাত করে সেই কক্ষ থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।
নিমেষের মধ্যেই ক্রোধে, অপমানে ও যন্ত্রণায় খাদিজার সুন্দর মুখশ্রী কালিবর্ণ ধারণ করল। তাঁর মনে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তিনি বাদশাজাদার গমন পথের দিকে চেয়ে ক্রোধকম্পিত ঘৃণিত স্বরে বললেন, 'নির্বোধ নুর, আমায় তুমি অপমান করলে—আঘাত করলে। এর প্রতিশোধ আমি নিশ্চয়ই নেব। তোমার উষ্ণ শোণিতে আমি যদি না স্নান করেছি তো আমার নাম খদিজা নয়! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থেকো বাদশাজাদা।'
অতঃপর খাদিজার প্রধান চিন্তা হলো কিভাবে নুরকে বাদশার বিষনজরে ফেলা যায়, কিভাবে পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার অন্তরে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করা যায়। অনেক ভাবনা চিন্তার পর বাদশা হাসাকিনকে ছলনার জালে জড়িয়ে কাজ হাসিল করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন তিনি। আর সেই উদ্দেশ্যেই, অঙ্গের আবরণ আর আভরণ লণ্ডভণ্ড করে, চুল ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মড়াকান্না জুড়ে দিলেন খাদিজা।
খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে অন্দরে ছুটে এলেন বাদশা। বেগমকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন তার এই দুর্দশা আর কান্নার কারণ কী? কিন্তু খাদিজা কোন উত্তর না করে কেঁদেই চললেন সমানে। শেষে বাদশা হাসাকিন যখন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'বেগম! সব কথা আমায় খুলে বল। যে দুর্বৃত্ত তোমার এই দুরবস্থা করেছে

আমি তার রক্তদর্শন না করে শান্ত হব না।'

খাদিজা এবার আত্ম-অভিলাষ সিদ্ধির সুবর্ণ-সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে বুঝতে পেরে দ্বিগুণ ভাবে কাঁদতে কাঁদতে জানালেন ঃ 'আমি সেই ভয়ানক কথা কিভাবে আপনার গোচরে আনব বুঝতে পারছি না প্রভু ! আপনি হয়তো আমায় বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আপনি আমার স্বামী—ইহকাল ও পরকালের দেবতা—আপনার শপথ করে মিথ্যা বলব না। আমার এই দুরবস্থার জন্য বাদশা-জাদা নূরই দায়ী। সে আপনাকে সরিয়ে এ রাজ্যের অধীশ্বর হতে চায়। আর তাই আমায় তাকে সাহায্য করতে বলেছিল। কিন্তু আমি তার কুপ্রস্তাবে রাজী হইনি বলে সে আমায় আহত ও অপমানিত করে চলে গেছে। এই দেখুন আমার গালে তার আঘাতের চিহ্ন।



এর পরের ঘটনা খুবই সহজ ও সরল। বাদশা হাসাকিন পাপী-য়সী খাদিজার ছলনায় ভুলে পুত্রকে ভুল বুঝলেন। রাগে কাঁপতে

কাঁপতে সভায় এসে ঘাতককে ডেকে আদেশ করলেন এই মুহূর্তে বাদশাজাদা নুরের শিরশ্ছেদ করা চাই।

সভাসদরা বাদশার এই আদেশ শুনে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। তাঁরা তো প্রথমে নিজেদের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। কথাটা সবাই ঠিক ঠিক শুনেছেন তো! এমনকি ঘাতক পর্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল। বাদশা যখন দ্বিতীয়বার একই আদেশ জারি করলেন তখন সকলের বিস্ময়ের ঘোর কাটল। কিন্তু তাঁরা অবাক হলেন এই ভেবে যে, এমন কী অঘটন ঘটল যে বাদশা সহসা স্বীয় পুত্রের মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞা দিচ্ছেন এবং তাও অমাত্য-বৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ না করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক বিরল আর অভিনব ঘটনা।



অবশেষে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সকলে একযোগে

বাদশার সমীপে উপস্থিত হলেন। তারপর এ রাজ্যের যিনি প্রধান উজীর তিনি সসম্মানে কুর্ণিশ করে বিনীত বচনে বললেন, 'মালিক!—আপনার এই নিষ্ঠুর আদেশের অন্তরালে কী কারণ নিহিত আছে আমরা তা জানি না এবং আপনিও প্রথাগত ভাবে আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে কোন আলোচনা বা পরামর্শ করে এ আদেশ জারি করেন নি। আপনার আদেশ অবশ্যই পালনীয় তবু আপনি হঠাৎ কেন এই আদেশ জারি করছেন তা প্রকাশ করলে আপনার অধীনস্থ এই দাসেরা নিজেদের ধন্য মনে করবে। সেই সঙ্গে প্রকৃত কারণ বা আসল তথ্য আমরা অবগত না হওয়া পর্যন্ত বাদশাজাদার মৃত্যুদণ্ড অন্ততঃ একদিনের জন্য স্থগিত রাখুন।'

বাদশা হাসাকিন প্রথমে প্রধান উজীরের পরে সমাগত অন্যান্য মাননীয় ওমরাহদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখলেন সকলের মুখেই একই সঙ্গে বিস্ময় ও বেদনাবোধের চিহ্ন মুদ্রিত রয়েছে। তিনি নিজেও কি কম বিস্মিত হয়েছেন বাদশাজাদা নূর-এর অপরাধের কথা শুনে! তিনিও কি ব্যথিত হচ্ছেন না একমাত্র প্রিয়পুত্রকে এভাবে কঠোর মৃত্যুসাজা দিতে! কিন্তু উপায় কি? বেগম খাদিজার কথা যে মিথ্যা নয় সে তো তিনি নিজের চোখেই দেখে এলেন। অতঃপর যে পাষাণ ভার তাঁর নিজের মনে চেপে বসে রয়েছে এই মুহূর্তে, তা সাময়িকভাবে অপসারণের জন্যও সমস্ত ঘটনা অমাত্যগণকে জানানো যুক্তিযুক্ত বলেই মনে করলেন বাদশা।

সমস্ত বিবরণ শোনার পর প্রধান উজীর বললেন, 'মালিক, অধীনের বেয়াদপি মাপ করবেন। আপনি জ্ঞানী বুদ্ধিমান এবং সুবিবেচক

হয়ে একজন স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করে এমন ক্রোধান্ধ হয়ে উঠবেন বাদশাজাদার উপর এ আমরা ভাবতেই পারছি না। বেগমসাহেবা বাদশাজাদার উপরে দোষারোপ করেছেন সত্য তিনি সেটা সপ্রমাণ করতে পারবেন কিনা তাই আগে বিবেচ্য। হুজুরালি, অপরাধ নেবেন না, তবু বলি আমরা এই ঘটনার পেছনে কিছু অশুভ ছায়া দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, বাদশাজাদার প্রাণ বিনাশ করাই বেগমসাহেবার প্রধান উদ্দেশ্য। কেন, তা এখনই বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মালিক, রমণীহৃদয় কুটিলতাময় এবং অস্থির। এবং তাদের কথায় বিশ্বাস করে নির্দোষ ও সর্বগুণান্বিত নিজ পুত্রের জীবনবিনাশ করবেন না। স্ত্রীলোকেরা যে কী ধরনের শঠজাল বিস্তার করে নিজেদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে থাকে তা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন শেখ শাহাবুদ্দিনের বৃত্তান্ত শুনলে। আপনি যদি শুনতে চান সে কাহিনী আমি আপনাকে শোনাতে পারি।

কৌতুহলী হয়ে বাদশা হাসাকিন সেই কাহিনী শুনতে চাইলে প্রধান উজির শুরু করলেন তাঁর গল্প।

শেখ শাহাবুদ্দিনের কাহিনী

"মিশরের সুলতান নাসির খুবই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর সভায় সদা সর্বদা জ্ঞানী ও গুণীজনের জমায়েত ছিল। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা প্রতিদিন নানান বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলাপ-আলোচনা করে সুলতানকে তৃপ্তিদানে প্রয়াস পেতেন। একদিন ঐশ্বরিক মহিমা নিয়ে তুমুল. আলোচনা হলো। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন যে, ঈশ্বরের মহিমা বোঝা সত্যিই দুরূহ, যেমন—জিবরাইল নামে এক স্বর্গদূত একদা নিশীথে পয়গম্বর হজরত মহম্মদকে শয্যা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে সপ্ত-স্বর্গ ঘুরিয়ে এনেছিলেন। মহম্মদ এই এক মুহূর্তের মধ্যেই

খোদ আল্লার সঙ্গে নব্বুই হাজারেরও বেশী শব্দের কথাবার্তা শেষ করে নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পর শয্যায় শয়ন করতে গিয়ে অনুভব করেন যে, তখনও শরীরের উষ্ণতায় তাঁর শয্যা উষ্ণ রয়েছে। শুধু তাই নয়, জিবরাইলের সঙ্গে যাবার সময়ে তাঁর পায়ের ধাক্কায় যে একটি জলপূর্ণ পানপাত্র পড়ে গেছিল মেঝেয়, তিনি ফিরে এসে দেখলেন, তখনও সেই পানপাত্রের সমস্ত জল গড়িয়ে শেষ হয় নি।

সুলতান এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন পণ্ডিতদের আলোচনা। তিনি আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললেন, 'মহাশয়রা!' আপনারা যা বলছেন তা কি সম্ভবপর? কেননা আপনারাই বলে থাকেন যে সাতটি স্বর্গ পরস্পর এত দূরে অবস্থিত যে, একটি থেকে অন্যটিতে যেতে হলে অশ্বের মত অতি দ্রুতগামী জন্তুরও পাঁচশো বছর সময় লাগবে। সুতরাং এক মুহূর্তের মধ্যে পরপর সাতটি স্বর্গ পরিভ্রমণ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে নব্বুই হাজার শব্দযুক্ত কথোপকথন শেষ করে আবার মর্ত্যধামে ফিরে আসা নেহাৎ-ই গালগল্প ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বিশ্বাস করি না। আপনাদের জ্ঞান ও গুণের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে বলে আপনারা তার সুযোগ নিয়ে এভাবে আমায় প্রতারণা করবেন না।'

সুলতানের কথায় পণ্ডিতেরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। একজন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠে জানালেন—'সুলতান, আপনি কী বিশ্বাস করলেন না করলেন তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। সত্য চিরকালই সত্য। এবং ঈশ্বরের মহিমা চিরদিনই দুর্বোধ্য। ঈশ্বরের কৃপায় অসম্ভব কাজই অনায়াসে সম্ভব

বিনা প্ররোচনায় হঠাৎ আমার রাজ্য আক্রমণের কারণ কী ? আমার সৈন্যরা তো কিছুই জানে না এ আক্রমণের। তারা প্রস্তুতও নেই যুদ্ধের জন্য। এখন তবে উপায় ? নিশ্চয়ই আমরা শত্রুর হাতে পরাজিত আর বন্দী হব।'

সুলতানের ব্যাকুলতা আর কাতরতা লক্ষ্য করে শাহাবুদ্দিন মৃদু হেসে জানালেন ঃ 'সুলতান ! বৃথা ভয় পাবেন না। আপনি যে অসংখ্য সৈন্য দর্শন করলেন তা প্রকৃত পক্ষে আপনার দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র। চোখের অলীক মায়া। আবার দেখুন—এই বলে তিনি জানালাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরে আবার খুলে দিলেন। সুলতান তার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কোথায় সেই সৈন্যবাহিনী! নির্জন প্রান্তর দুপুর শুধু ধু ধু করছে।

শাহাবুদ্দিন অতঃপর আর একটি জানালার কাছে গিয়ে সেটা খুলে তার মধ্যে দিয়ে সুলতানকে দৃষ্টিপাত করতে বললেন। ঐ জানালা দিয়ে সুন্দরী কায়রো নগরীর একাংশ নজরে আসে। সুলতান দেখলেন, তাঁর সাধের নগরীর ঐ অংশ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। এবং সেই নিদারুণ অগ্নি লেলিহান রূপ ধারণ করে অতি দ্রুত রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটে আসছে। লোকজন দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি করছে। আগুন নেভাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছে। সে এক বিশৃঙ্খল কাণ্ড।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলেন সুলতান, 'কি ভয়ঙ্কর বিপদ। এর হাত থেকে বাঁচার উপায় কিছু দেখছি না। হায় হায়। সারা কায়রো বুঝি আজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আমরাও মরব। হায় হায়।'

শেখসাহেব সুলতানের যার পর নাই কাতরতা দেখে মৃদু হেসে বললেন, 'সুলতান! ভয় পাবেন না। আপনি যা দেখছেন সবই চোখের ভুল মাত্র। শান্ত হোন।' এই বলে তিনি জানালাটি কয়েক লহমার জন্য বন্ধ করে আবার খুলে দিয়ে বললেন, 'এবার দেখুন।'

সুলতান দেখলেন—কোথায় আগুন! কোথায় কি! সব শান্ত সব প্রসন্ন। কায়রো নগরী আগের মতই রয়েছে।

এবার তৃতীয় জানালাটি খুলে দিলেন শাহাবুদ্দিন। সুলতান তার মধ্যে দেখতে পেলেন: মিশরের জীবনদাতা নীলনদ আজ যেন ক্ষেপে উঠেছে। কী ভয়ংকর তার রূপ! কী বিধ্বংসী তার চেহারা। একটি দোতলা বাড়ির সমান উঁচু হয়ে নীলনদের জলরাশি সবকিছু প্লাবিত করে, সব কিছু ডুবিয়ে দিয়ে, প্রবল গর্জনে ছুটে আসছে রাজপ্রাসাদের দিকে। লোকের আর্তনাদে আর জলোচ্ছ্বাসের গম্ভীর গর্জনে আকাশ-বাতাস মুখরিত।

সুলতান বারবার দুবার ঠকে গিয়ে এবারও ভাবলেন—এও দৃষ্টি-বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু নীল-এর জলরাশি যত কাছে হচ্ছে তার আকার ততই ফেঁপে-ফুলে উঠছে—তার গর্জন ততই বাড়ছে—কানে তালা ধরার অবস্থা। তখন সুলতানের মনের দৃঢ়তা ভেঙে গেল। বিশ্বাস দূরে সরে গেল। তিনি অসহায়ের মত হায় হায় করে উঠলেন প্রাণের ভয়ে। কাতর কন্ঠে আল্লাকে ডাকতে লাগলেন দু'চোখ বুঁজে।

শেখসাহেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'সুলতান, সুস্থির হোন। চোখ খুলুন। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সবই দৃষ্টির হেরফের মাত্র! এই দেখুন।' এই বলে তিনি জানালাটি একবার বন্ধ

করে পরক্ষণে খুলে ধরতেই সুলতান আশ্বস্ত চিত্তে দেখলেন। সত্যই, যা দেখেছেন একটু আগে সবই ভুল। নীলনদ শান্ত সুবোধ ভাবে বয়ে চলেছে আগের মতই। জলপ্লাবনের ছিটে ফোঁটা চিহ্নও চোখে পড়ে না কোথাও। দুই তীরের মানুষজন—নৌকার মাঝিমাল্লারা—সকলেই নিরুদ্বিগ্নভাবে যে যার কাজে ব্যস্ত। দেখে সুলতানের বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা রইল না।



শাহাবুদ্দিন অবশেষে চতুর্থ এবং শেষ জানালাটির পাল্লা খুলে দিলেন। এই জানালা দিয়ে আফ্রিকার সুবিখ্যাত সাহারা মরু-

ভূমিকে দেখা যায়। শেখ সাহেবের নির্দেশে সুলতান সাহারায় দিকে তাকালেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য! এ তো সাহারার সেই চির-পরিচিত ভয়ংকর চেহারা নয়। এ যে তার বিপরীত রূপ! সুলতান দেখলেন— সাহারার সেই ধূ ধূ করা নিষ্করুণ বালিরাশি মন্ত্রবলে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে শোভা পাচ্ছে একটি মনোহর শ্যামল উদ্যান। উদ্যানের চারিদিকে নানা রকম তরুলতা এবং ফল ও ফুলের গাছ। গন্ধে বাতাস ম ম করছে। মৌমাছি আর প্রজাপতির খেলা চলছে ফুলের সঙ্গে। কোন কোন গাছের ডালে পাখী বসে গান গাইছে মধুর সুরে। উদ্যানের মধ্যে একটি সরোবর। তাতে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। হাঁসের দল সাঁতার কাটছে। মাঝে মাঝে মাছেরা তার শান্ত জলে ঘাই মেরে জানিয়ে দিচ্ছে, আমরাও আছি।

সুলতানের বিস্ময়ভরা মুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে শেখসাহেব বললেন, 'সুলতান! যা দেখছেন তা-ও আপনার চোখের ভুল। এই দেখুন।'

শাহাবুদ্দিন জানালাটি বন্ধ করে পুনরায় খুলে দিতেই দেখা গেল সেই রমণীয় উদ্যানটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। আবার সেই সাহারার গম্ভীর আর মনে ভয় ধরানো দৃশ্য জুড়ে বসেছে সুলতানের দৃষ্টি পথে।

শাহাবুদ্দিন অতঃপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'সুলতান! আজ আপনি অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন বটে, কিন্তু আমি আপনাকে এর চেয়েও অনেক বেশী আশ্চর্যের আর একটি অভাবনীয় দৃশ্য দেখাতে চাই। আপনি একটি বড় দেখে জল

ভরা স্নানপাত্র আনতে আপনার কোনও ভৃত্যকে আদেশ করুন। আজ্ঞামাত্র রাজভৃত্যরা একটি বিরাট জলপূর্ণ স্নানপাত্র এনে সেই ঘরে রাখল আর তাঁর অনুরোধ মত কিছু দাস-দাসী ও কয়েকজন বিশিষ্ট অমাত্যকেও সেই কক্ষে ডেকে আনা হলো।

এরপর শেখ শাহাবুদ্দিন সুলতানকে বললেন, 'সুলতান! আপনি এবার আপনার পোশাক-আশাক ছেড়ে এই পাত্রের মধ্যে এসে বসুন। তারপর জলে মাথাটা একবার ডুবিয়েই সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেবেন।'

সুলতান নাসির পোশাক-আশাক ছেড়ে কেবলমাত্র একটি স্নানবস্ত্র সম্বল করে জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে গিয়ে বসলেন। তারপর শেখ শাহাবুদ্দিনের নির্দেশে অবগাহনের নিমিত্ত জলের মধ্যে মাথা ডোবানো মাত্রই যেন প্রবল জলস্রোতে তিনি খড়কুটোর মত ভেসে গেলেন কোথায়। যখন মাথা তুললেন তখন দেখলেন তিনি এক অচেনা-অজানা জায়গায় সমুদ্রতীরস্থ এক পর্বতের সানুদেশে ভেসে উঠেছেন।

সুলতান যেমন ভয় পেলেন তেমনই রেগে উঠলেন শেখসাহেবের উপর। তাঁকে যা মুখে আসে তাই বলে গালমন্দ করতে লাগলেন। মনে মনে স্থির করলেন, আগে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাই, তারপর শেখের এই হঠকারিতার উপযুক্ত প্রতিশোধ আমি নেব।

জল থেকে ডাঙায় উঠে পড়লেন সুলতান নাসির। তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে যে দিকে দু-চোখ যায় সেই দিকে চলতে শুরু করলেন চলতে চলতে এক বনে গিয়ে পড়লেন। ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন, কতকগুলি কাঠুরে সেই বনে কাঠ কাঠছে। সুলতান

মানুষজন দেখে খুবই আহলাদিত হলেন। কিন্তু চিন্তায় পড়লেন নিজের কী পরিচয় দেবেন এই ভেবে। কেননা তাঁর যথার্থ পরিচয় এরা কেউ বিশ্বাস করবে না, তাঁকে উপহাস করবে। যাই হোক এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সুলতান কাঠুরেদের দিকে এগিয়ে চললেন।

কাঠুরেরা এই বনে এক অচেনা-অজানা বিদেশী মানুষকে দেখে খুবই আশ্চর্য জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে? এই গহন বনে কেন এসেছ?'

সুলতান জবাব দিলেন, 'ভাইসব, আমি একজন সওদাগর জল-পথে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে ছিলাম। পথিমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে সদলবলে জলমগ্ন হই। সঙ্গী-সাথীরা আর বাণিজ্যের জিনিসপত্র সবই জলের তলায় তলিয়ে গেছে, আল্লার কৃপায় আমিই শুধু প্রাণে বেঁচে গেছি এই সর্বনাশা বিপদে। তোমরা দয়া করে আমায় খাদ্য-বস্ত্র এবং আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কর।

আগন্তুকের দুর্দশার কথা শুনে কাঠুরেদের মনে দয়া হলো। কিন্তু তারা নিজেরাই গরীব—অপরকে কী আর কতটুকু সাহায্য করবে? তবু তারা তাঁকে খাদ্য-বস্ত্র এবং পাদুকা দিয়ে যথা-সাধ্য সাহায্য করল। সুলতান কাঠুরেদের দেওয়া জামা জুতো পরে, অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে তাদেরই নির্দেশমত পথে চলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক সুরম্য নগরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নগরীতে প্রবেশ করার পর সুলতানের সঙ্গে সর্বপ্রথম যার আলাপ হলো, সে একটি প্রৌঢ় ফকির। প্রৌঢ় তাঁর বৃত্তান্ত শুনে খুব দুঃখ পেল। এবং সুলতানকে সান্ত্বনা দিয়ে জানাল, 'যুবক, তোমার দুর্ভাগ্যের বিবরণ শুনে খুবই দুঃখ পেলাম। সবই

খোদাতালার মহিমা। যাক, আমি তোমায় আপাততঃ একটা পরামর্শ দিচ্ছি শোন। তুমি যদি সেই মত কাজ কর তবে নিশ্চয় সুখী হবে।"

সুলতান সাগ্রহে জানতে চাইলেন কী তার সেই পরামর্শ।

ফকির বলল, এই নগরীর পশ্চিম প্রান্তে একটি হামাম আছে। সেই হামামে কেবল স্ত্রীলোকেরাই স্নান করতে পারে। তুমি যাও গিয়ে সেই হামামের প্রবেশ পথের কাছে কোথাও বসে থাক। যথা সময়েই দেখবে নগরীর স্ত্রীলোকেরা সেখানে একে একে অথবা সঙ্গী সাথী নিয়ে স্নান করতে আসছে। তুমি কোন রকম ভয় না পেয়ে, দ্বিধা না করে তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করবে সে বিবাহিতা কিনা। যে বলবে সে অবিবাহিতা তুমি তৎক্ষণাৎ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে। আমি বলছি এতে তোমার ভাগ্য অবশ্যই ফিরবে।'

ফকির সাহেবের কথামত নিজের ভাগ্য ফেরাবার আশায় মিশরপতি নগরের পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে সেই হামামের দরজার একপাশে বসে সেখানে আগত প্রতিটি মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তার স্বামী আছে কিনা। সকলেই উত্তর দিল—হ্যাঁ, স্বামী আছে।

এইভাবে জনাচল্লিশেক নারীকে প্রশ্ন করার পর এবার যে মহিলাটি স্নানাগারে স্নান করতে এলো তার বেশভুষা যেমন মহার্ঘ, রূপরাশি তেমনই অনুপম। দেখে সুলতান মুগ্ধ

হয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, ইতিপূর্বে তিনি তাঁর মিশরের হারেমে এ মহিলার তুল্য আর কোনও রূপসীকে দেখছেন কিনা কিন্তু এমন সুন্দরী ও অর্থশালিনী নারী এখনও কুমারী হয়ে আছে, একথা মানতে মন চাইল না সুলতানের। আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলভে তিনি রমণীকে তাঁর প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেন।

রমণী একবার ভ্রূভঙ্গী করে সুলতানের দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দিল, 'না, আমার এখনও বিয়ে হয় নি।' এই বলে গর্বিত-ভাবে হামামে ঢুকে গেল।

জবাব শুনে সুলতানের যেমন আহলাদ হলো তেমনি আবার বিষাদও অনুভব করলেন। ভাবলেন, বিয়ে হয়নি তো কি হয়েছে। তা বলে তাঁর বর্তমান অবস্থা দেখে, ছেঁড়া ময়লা পোষাক ..... ছেঁড়া জুতো..... অনাহারক্লিষ্ট অপরিছন্ন চেহারা সত্ত্বেও সে যে তাঁকে পতিত্বে বরণ করে নেবে, এমন তো মনে হয় না।

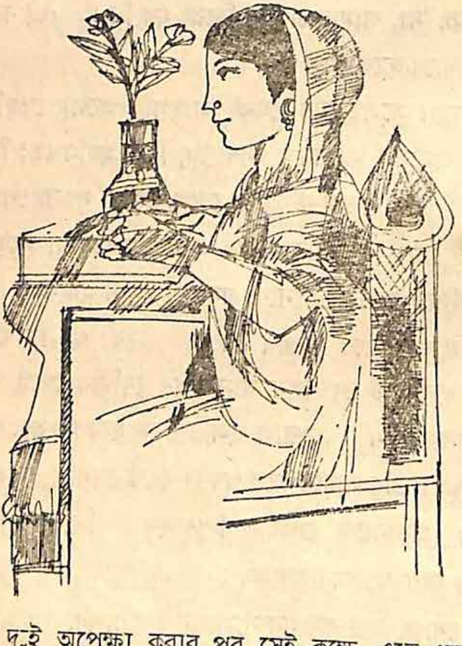
নিজের সুখ-দুঃখের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকায় সেই ধনী ও রূপসী যুবতীটি যে কখন স্নান সেরে বেরিয়ে গেছে তা তিনি খেয়াল করেন নি। খেয়াল হল জনৈক হাবসী ভৃত্যের কথায়। হাবসী ভৃত্য তাঁর সামনে এসে গম্ভীর কণ্ঠে জানাল, 'আকা আমার মালকিন আপনাকে সেলাম দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রাসাদে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

বিস্ময়ে সোজা হয়ে বসলেন সুলতান। বললেন, 'তোমার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কোনও ধনী লোকের ভৃত্য। তুমি ঠিক জান তো, আমার মত এক দরিদ্র বিদেশীকেই তোমার মনিব ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রাসাদে!'

'হ্যাঁ, আমি ঠিক জানি, আসুন আমার সঙ্গে।'

সুলতান আর দ্বিরুক্তি না করে সেই হাবসী ভৃত্যের অনুগমন করলেন।

অনন্তর হাবসী ভৃত্য একটি সুরম্য অট্টালিকায় প্রবেশ করে, একটি সুসজ্জিত কক্ষে সুলতানকে বসিয়ে অন্যকক্ষে চলে গেল। সুলতান উৎকণ্ঠা আর ঔৎসুক্যে জরসর হয়ে বসে রইলেন সেখানে 'কি হয়' 'কি হয়' ভেবে।



প্রায় ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করার পর সেই কক্ষে একে একে প্রবেশ করল চারজন সুন্দরী রমণী। কী তাদের রূপ! কী তাদের বেশভূষা! দেখলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

সুলতান তড়িঘড়ি নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর

খুব ইচ্ছা করল জানতে, এরা কারা, কী উদ্দেশ্যে তাঁকে এখানে ডেকে এনেছেন। এদের মনিবকেই তো তিনি চেনেন না। সেই সময়ে তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এই চারজনের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা নানান রত্ন-অলঙ্কার শোভিতা, অবগুণ্ঠনবতী আর একটি অনিন্দ্য সুন্দরী নারীমূর্তির ওপর। তাকে দেখে মনে হলো কয়টি তারার মাঝে একটি পূর্ণচন্দ্রের মত।



নারীমূর্তিটি অবগুণ্ঠন মোচন করে সকলের সামনে এগিয়ে

এলো। এবার তাকে চিনলেন সুলতান। হামামের সামনে দেখা সেই রূপসী রমণী।

সুন্দরী সুলতানের কাছে এসে জানাল, দেশীয় প্রথা অনুযায়ী তারা পরস্পরকে বিবাহ করতে বাধ্য। অতএব বিদেশী অতিথি যেন বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়। আজ রাতেই বিবাহ সম্পন্ন হবে।

যথাসময়ে যথাবিহিতভাবে সেই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার সঙ্গে মহাসমারোহে শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল মিশরপতির।

যাই হোক, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সুন্দরী পত্নীর সঙ্গে এক এক করে পরিপূর্ণ চৌদ্দটি বছর কাটিয়ে দিলেন সুলতান। ইতিমধ্যে তাঁর সাত সাতটি পুত্রের জন্ম হয়েছে। অবশেষে সুলতানেরও সুখের দিন শেষ হয়ে দুঃখের দিন শুরু হলো। নিজেদের অপরিণামদর্শিতা ও নিদারুণ অপব্যয়ের জন্য অতুল ঐশ্বর্যের আর কণামাত্র অবশিষ্ট রইল না। শেষ পর্যন্ত সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে ঘরের জিনিসপত্র বেচতে হলো। তাও যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, বেচার মত আর কিছুই যখন রইল না ঘরে তখন স্ত্রী একদিন স্বামীকে ডেকে বলল, 'আর তো কিছুই নেই যা বিক্রী করে বাচ্চা-কাচ্চাদের মুখে আর নিজেদের মুখে কিছু দিই। তুমি শক্ত-সমর্থ পুরুষ মানুষ। এবার তোমার উচিত কোনও কাজ কর্ম করে সংসার প্রতিপালন করা।'

সুলতান স্ত্রীর কথার সারবত্তা বুঝে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। তারপর সেই ফকিরের খোঁজে চললেন। তাঁর সৌভাগ্যই বলতে হবে ফকির তখনও বেঁচে ছিল অতিবৃদ্ধ হয়ে। সুলতান তাঁর কাছে গিয়ে নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী শোনালেন ও তার

পরামর্শ চাইলেন।

ফকির জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি কোন ব্যবসা শিখেছ?'

—'আজ্ঞে না।'

চিন্তায় পড়ল ফকির। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে সুলতানের হাতে দু'টি তাম্রমুদ্রা দিয়ে বলল, 'এই পয়সায় তুমি একগাছা দড়ি কিনে বাজারের ধারে গিয়ে বস। তারপর কারো মাল বইবার জন্য মুটের দরকার হলে তুমি মুটেগিরি কোর। এছাড়া আর তো কোন পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না তোমার রোজগারের।'

সুলতানতো বাক্যহারা। শেষকালে মুটেগিরি!

কি আর করেন। অগত্যা পয়সা দু'টি দিয়ে একগাছা মজবুত দেখে দড়ি কিনে খদ্দেরের আশায় বাজারের ধারে গিয়ে বসলেন। খানিকক্ষণ বসার পর খদ্দেরও জুটে গেল একজন।

কিন্তু অনভ্যস্ত কাজে তাঁর খুব কষ্ট হলো। সামান্য মোটই তাঁর কাছে বিরাট ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়াল। ফলে সারাদিনে দুটির বেশী তিনটি মোট তিনি বইতে পারলেন না। সন্ধ্যেবেলায় ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলেন মাত্র চারটি পয়সা রোজগার করে। তাঁর স্ত্রী স্বামীর এই সারাদিনের উপায় দেখে খুবই বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে বললে, 'এই পয়সায় আমাদের সকলের কী খাওয়া-দাওয়া হবে? কম করেও রোজ বিশটি করে পয়সা উপায় না করলে উপোস করেই মরতে হবে সবাইকে।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার কাজের ধান্দায় বাইরে বেরোলেন সুলতান। কিন্তু অন্যমনস্ক ও চিন্তাযুক্ত থাকায় বাজরের পথে না গিয়ে ভুল পথে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়লেন। সমুদ্রের ধারে আসা মাত্রই তাঁর মনে অতীতের সব স্মৃতিই জেগে উঠল।

তাঁর চোখে জল এলো। তিনি অবসন্ন আর বিষণ্ণ দেহে-মনে সমুদ্রের কূলেই বসে পড়লেন।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। মসজিদে মসজিদে সান্ধ্যোপাসনার আজান পড়তে লাগল। সুলতানের কানেও পেঁছিল সে ডাক। তিনি শুচিস্নাত হয়ে ঈশ্বর ভজনার জন্য সমুদ্রে নামলেন স্নান করতে। এক ডুব দিয়ে মাথা তুলতেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন। কোথায় সমুদ্র! তিনি ইতিপূর্বে যে জলপাত্রে অবগাহন করেছিলেন সেই জলপাত্রের মধ্যেই বসে আছেন। কিংকর-কিংকরী, রাজকর্মচারীবৃন্দ এবং স্বয়ং শেখ শাহাবুদ্দিন তাঁর সামনে দণ্ডায়মান রয়েছেন।

সুলতান নাসির নিজের অপরিসীম দুঃখ ও দুর্দশার কথা স্মরণ করে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রথমেই শেখসাহেবকে তীব্র কটুভাষায় ভর্ৎসনা করলেন।

শাহাবুদ্দিন তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'সুলতান! আপনি অনর্থক আমায় দোষারোপ করছেন। আপনি তো মুহূর্তমাত্র জলে দেহ ডুবিয়ে মাথা তুলে নিলেন। বিশ্বাস না হয়, আপনার দাস-দাসী আর আমাত্যদেরই জিজ্ঞেস করুন।

সকলেই সমস্বরে শেখ শাহাবুদ্দিনের কথার সমর্থন জানাল।

কিন্তু সুলতান কিছুতেই শান্ত হলেন না সে কথায়।

তখন শাহাবুদ্দিন বিনীত বচনে বললেন, 'সুলতান! আমার কথায় আপনি বিশ্বাস করলেন না বটে তবে একটি কাজ করে আমি আপনাকে আপনার হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি পোষাক খুলে ফেলে কোমরে এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে সেই জলপাত্রে নেমে ডুব দিলেন।

সুলতানের তখনও রাগ কমেনি। তিনি মনে মনে বললেন, শয়তান! আমায় যেমন কষ্ট দিয়েছ আজ তেমনি তার প্রতিফল দেব। জলের ওপরে মাথা তুললেই তোমার মস্তকছেদন করব আমি। এই চিন্তা করে তিনি একজন অমাত্যের কাছ থেকে একটা তরবারি চেয়ে নিলেন।

শেখ শাহাবুদ্দিন চতুর, বুদ্ধিমান এবং ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি সুলতানের মুখভাব দেখেই তাঁর মনোভাব আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে যাদুবলে অন্তর্হিত হয়ে সোজা চলে গেলেন দামাস্কাস নগরীতে। তারপর সেখান থেকে মিশরের সুলতানকে একখানা চিঠি লিখলেন—

পরম সম্মানীয়েষু,

সুলতান! আমরা খোদাতালা তৈরী অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য জীবমাত্র। অতএব তাঁর মহিমার মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের সাধ্যাতীত। দেখুন, আপনি মুহূর্তমাত্র জলে ডুবে ছিলেন কিন্তু এই মুহূর্তকাল আপনার কাছে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর বলে মনে হয়ে। এই সময়ের মধ্যে আপনি এক অচেনা অজানা দেশে গিয়ে সেখানকার এক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করে, সংসারী হয়ে সাত সাতটি সুত্রসন্তানের জনক হয়েছিলেন। তারপর সুখে

স্বাচ্ছন্দ্যে চৌদ্দটি বৎসর কাটিয়ে অবশেষে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে নিজেদের ভরণপোষণের জন্য মুটেগিরি পর্যন্ত করেছিলেন। আপনি নিজে এ ঘটনার একজন পরম ভুক্তভোগী হয়েও পূজ্যপাদ পয়গম্বর হজরত মহম্মদের নিমেষের মধ্যে সপ্তস্বর্গ পরিভ্রমণ করে আবার নিজের আবাসে ফেরার বিষয় অবিশ্বাস করছেন কেন বুঝতে পারছি না। যাঁর মহিমার অনন্ত শূন্যে চন্দ্র সূর্য পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে—সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের অসাধ্য কিছু নেই বলেই জানবেন। ইতি—

শেখ শাহাবুদ্দিনের চিঠি পেয়ে ও পড়ে সুলতানের মনের অবিশ্বাস দূর হলো বটে কিন্তু তাঁর ক্রোধের পরিসমাপ্তি তাতে ঘটল না। তিনি অবিলম্বে তাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় মিশরে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানালেন দামাস্কাসের সুলতানকে।

দামাস্কাসের সুলতান মিশরপতির অনুরোধের সম্মান রাখতে শেখ শাহাবুদ্দিনে খোঁজে রাজ্যের চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন, তাঁকে বন্দী করে রাজ দরবারে আনা চাই।

শাহাবুদ্দিন তখন নগরের উপকণ্ঠে একটি মসজিদের চত্বরে বসে বিশ্রাম করছিলেন। খবর পেয়ে রাজকর্মচারীরা তাঁকে বন্দী করতে গিয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, তাঁর অনুরাগী শত শত অস্ত্রধারী পুরুষ শাহাবুদ্দিনকে ঘিরে রেখে তাঁকে রক্ষা করছে। এই দেখে তারা সেখান থেকে পালিয়ে সুলতানের দরবারে এসে তাঁকে সমস্ত সংবাদ নিবেদন করল।

দামাস্কাস অধিপতি এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে ডেকে তাঁকে অবিলম্ব শেখ শাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে আদেশ দিলেন।

যথা সময়ে দুই দলে মুখোমুখি হয়ে ঘোর সংগ্রামে মেতে উঠল। কিন্তু শাহাবুদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে



দামাস্কাস বাহিনী তিষ্ঠোতে না পেরে অচিরেই রণে ভঙ্গ দিল।

বিমর্ষ মনে বিষন্ন বদনে দরবারে বসে আছেন দামাস্কাস সুলতান। পরাজয়ের গ্লানি ভীষণভাবে পীড়িত করে তুলেছিল তাঁকে। তাঁর এই রকম মনমরা ভাব লক্ষ্য করে প্রধান উজির তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'জাঁহাপনা! বিমর্ষতা আপনার শোভা পায় না। শেখ শাহাবুদ্দিন একজন ঐন্দ্রজালিক। তিনি ইন্দ্রজাল শক্তির সাহায্য আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, এত

আমাদের অপমানের কিছু নেই। একটা উপায় আছে তাঁকে বন্দী করার। যদি কোন রকমে তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতা হ্রাস করা যায় তবে আমাদের জয় অনিবার্য। অতএব সর্বাগ্রে শাহাবুদ্দিনের এই দৈবী ক্ষমতা নষ্ট করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া দরকার। আর সুন্দরী নারী ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করা দুষ্কর। আমার পরামর্শ শুনুন প্রভু। আপনি এ রাজ্য থেকে একটি সুন্দরী যুবতীকে বেছে নিয়ে শেখ সাহেবের কাছে উপহার পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন। তাকে শিখিয়ে দিন, সে যেন শাহাবুদ্দিনকে আয়ত্ত করেই আপনার কাছে সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠায়। তখন আপনি আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অসুবিধা বোধ করবেন না।'

পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ হলো। শাহাবুদ্দিনের মত জ্ঞানী গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিও মুহূর্তের ভুলে সুলতানের পাতা ফাঁদে পা দিলেন। তিনি দামাস্কাস সুলতানের আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে তাঁর উপহার সামগ্রী সানন্দে গ্রহণ করলেন। এবং সুলতানের পাঠানো সুন্দরী রমণীটির রূপে তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করে, নানান আমোদ আহলাদে দিন কাটাতে লাগলেন।

একদিন সেই সুন্দরী কপটচারিণী সুযোগ বুঝে শাহাবুদ্দিনকে বলল, 'স্বামী। দাসীর একটি প্রার্থনা আছে।'

—'কী প্রার্থনা, বল ?'

—'শুনেছি, আপনি নাকি সবসময়েই নিজেকে দৈবশক্তিতে শক্তিমান করে রাখেন। কিন্তু এমন কোন সময় আসে না কি, যখন

আপনি এই শক্তির প্রভাব থেকে দূরে সরে গিয়ে একজন সাধরণ মানুষ হিসেবে থাকেন?'

শুনে শেখ সাহেবের মুখ গম্ভীর আকার ধারণ করল। তিনি বললেন, 'আর কখনও আমাকে এ প্রশ্ন করবে না। এতে তোমার কোনও উপকার হবে না।'

অতঃপর চলল দুজনের মধ্যে বুদ্ধি আর চাতুর্যের খেলা। সুন্দরী নারীদের হাতে থাকে অনেক রকমের অস্ত্র। যার প্রয়োগে তারা অনেক দৃঢ়চেতা পুরুষকেও এক সময়ে ঘায়েল করে ফেলে। এই অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে একটি হলো অভিমানের অশ্রু। শাহাবুদ্দিনও



শেষ পর্যন্ত এই চোখের জলের অস্ত্রেই ঘায়েল হলেন। ছলনাময়ী নারী জানতে পারল স্বামীর গুপ্তকথা। যথাসময়ে এই খবর চলে গেল দামাস্কাস সুলতানের কাছে।

শাহাবুদ্দিন শোবার সময় নিজের বিছানায় পাশে একটি মন্ত্রপূত জলপাত্র রাখতেন। তার কারণ এই যে, তিনি প্রত্যুষে ঐ জলে স্নান করে আবার দৈববলে বলীয়ান হয়ে উঠতেন।

ঘটনার দিন রাত্রে রাজপুরুষেরা যখন শেখ শাহাবুদ্দিনের বাড়ি ঘেরাও করে সুযোগ ও সংকেতের অপেক্ষায় রয়েছে, সেই সময়ে স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতে করতে সুন্দরী হঠাৎ পা দিয়ে জলাধারটি উল্টে ফেলে দিল। তারপর কাঁচুমাচু মুখে স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার জল ভরে আনবার ছল করে ঘরের বাইরে গিয়ে শাহাবুদ্দিনের অগোচরে সংকেত পাঠিয়ে দিল অপেক্ষমান রাজ-অনুচরদের কাছে। তারা সংকেত পেয়ে বাড়ির ভেতরে সদলবলে ঢুকে শাহাবুদ্দিনকে বন্দী করতে উদ্যত হলো।

শেখ শাহাবুদ্দিন মুহূর্তের মধ্যে স্ত্রীর শঠতায় পরিচয় পেয়ে তড়িঘড়ি আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেন।

তিনি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে দুহাতে দুটো জ্বলন্ত মোম-বাতি ধরে গোটাকতক মিথ্যে আজেবাজে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে চরকির মত বিছানার চারধারে পাক খেতে লাগলেন। যারা তাঁকে বন্দী করতে এসেছিল তারা এই কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। শাহাবুদ্দিন আবার কি নতুন চাল চালছেন ভেবে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে দুদ্দাড় করে সবাই পালাল। ইতিমধ্যে শাহাবুদ্দিন বাড়ির দরজা বন্ধ করে নতুন করে জল মন্ত্রপূত করে সেই জলে স্নান করে পুনরায় দৈববলে বলীয়ান হয়ে উঠলেন। এবং বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে তার শঠতার সমুচিত প্রতিফল দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি নিমেষের মধ্যে তাকে নিজের রূপে, আর নিজেকে তার রূপে রূপান্তরিত করে, বাড়ির দরজা খুলে সেই পলায়নরত সৈন্যদের

আবার ফিরে আসার জন্য চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। বললেন, তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি স্বয়ং শেখসাহেবকে বন্দী করে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।'

অতঃপর সুলতানের লোকেরা সাহস পেয়ে এবার ফিরে এলো সবাই মিলে আর স্ত্রীরূপিণী শাহাবুদ্দিনের সহায়তায় শাহাবুদ্দিনরূপী তাঁর স্ত্রীকে বন্দী করে নিয়ে গেল রাজসভায়। এই বন্দীকে দেখা মাত্রই দামাস্কাস সুলতান ঘাতককে আদেশ দিলেন তার মাথা কেটে ফেলার জন্য ; ঘাতক অবিলম্বে নিজের কাজ শেষ করল।

এতক্ষণে এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন শাহাবুদ্দিন। তিনি এবার রমণীরূপ পরিত্যাগ করে নিজের আসল চেহারায় ফিরে গেলেন। ব্যাপার দেখে দরবার শুদ্ধ সবাই থ। শেখসাহেব দামাস্কাস অধিপতিকে সম্বোধন করে বললেম, 'সুলতান ! আপনি মিশরপতির অন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আমার সঙ্গে যে হীন ব্যবহার করেছেন, তার প্রতিফল হিসেবে আমি যে আপনার প্রাণ বধ না করে আপনার এক অনুচরীর প্রাণ হরণ করেছি, এর জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ দিন। কিন্তু ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার চেষ্টা করলে আর আপনাকে ক্ষমা করব না মনে রাখবেন।' এই বলে শেখ শাহাবুদ্দিন মন্ত্রবলে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।'

গল্প শেষ করে প্রধান উজীর বাদশা হাসাকিনকে বললেন, 'মালিক ! রমণীরা যে কেমন ধূর্তামি করে পুরুষের সর্বনাশ সাধন করে থাকে

আশা করি শেখ শাহাবুদ্দিনের কাহিনী থেকে আপনি সে কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন। অতএব বেগমসাহেবার কথায় বাদশাজাদার প্রাণদণ্ড না দিয়ে আগে তাঁর দোষের বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে দিন। মনে হচ্ছে এই ঘটনার পেছনেও কোন ছল-চাতুরি ও শঠতার ছায়া লুকিয়ে আছে।'

বাদশা হাসাকিন প্রধান উজিরের কথায় পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ সেদিনকার মত স্থগিত রাখলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। প্রকৃত ঘটনা কি তার অনুসন্ধানের জন্য নূরকে আপনাদের কাছে জিম্মা করে দিচ্ছি। যা করার আগামীকাল করা যাবে।'

ঘটনাটা খাদিজার কানেও উঠল। তিনি মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। এবং যথা সময়ে বাদশা হাসাকিন তাঁর মহলে উপস্থিত হলে খাদিজা তাঁকে বিবিধ রকম আদর আপ্যায়ণ করে অবশেষে সুযোগ বুঝে বললেন, 'হজরত! আপনি মায়ায় পড়ে বাদশাজাদা নূরকে বধ না করে যে ভুল করলেন তার চেয়ে বড় ভুল আর হয় না। যে পুত্র তার পিতার মৃত্যু চায়—সিংহাসন দখল করতে চায়—শাস্ত্রে

বলে তাকে বধ করার চেয়ে পুণ্য কাজ আর কিছু নেই। আপনি যদি এই শত্রু নিপাত না করেন তবে আপনাকেও দিল্লীর সুলতানের মত অনুতাপের অনলে পুড়ে ছাই হয়ে শেষ মৃত্যুবরণ করতে হবে। শুনবেন সে কাহিনী?'

এই ভাবে বাদশা হাসাকিনের দশজন উজীর প্রতিদিন প্রত্যেকে একটি করে কাহিনী শুনিয়ে বাদশাকে প্রতিনিবৃত্ত করতেন পুত্র-হত্যা থেকে আর মহিষী খাদিজা পাল্টা কাহিনী শুনিয়ে তাঁকে উত্তেজিত করে তুলতেন। শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় আর অসত্যের পরাজয় ঘটল। প্রকৃত ব্যাপার জেনে বাদশা পুত্রকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দিলেন এমনকি তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। আর খাদিজাকে দিলেন নির্বাসন।—এই গল্পগুলি নিয়েই তুরস্কের গল্পগাথা গড়ে উঠেছে।

দুই শাহজাদার গল্প



অনেক কাল আগে মহম্মদ তোকিস এবং গিয়াসউদ্দিন নামে দুই পরাক্রান্ত সুলতান যথাক্রমে দিল্লী ও গজনীতে রাজত্ব করতেন। তাঁদের সুশাসনে দুই রাজ্যের প্রজারাই পরম সুখে আর নির্ভয়ে কালাতিপাত করত। দুই সুলতানই সমানভাবে নানান রাজোচিত গুণের অধিকারী ছিলেন। এমন কি নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট সম্প্রীতির ভাব বিদ্যমান ছিল।

যথাকালে দুই সুলতানের দুই পুত্রসন্তান জন্মলাভ করল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুই পুত্রই একই বৎসরে একই দিনে একই সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।



গজনীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন নিজের পুত্রকে সুশিক্ষিত, সুচরিত্র ও সুস্বভাবী করার জন্য রাজ্যের নানান শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত

মণ্ডলীকে শাহজাদা শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। শাহজাদা যদি কোন বিষয় শিখতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন বা কারো প্রতি আচরণে অসৌজন্যতা প্রকাশ করতেন বা কোন ব্যাপারে দোষ করতেন তবে সুলতান তাঁকে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি দিতে কখনও কুণ্ঠিত হতেন না। অর্থাৎ পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা এবং সঠিক আচার আচরণের দিকে সুলতানের তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সময় সময় পুত্রের ওপর তিনি মাত্রাতিরিক্ত কঠিন হয়ে পড়তেন।

শিক্ষকেরা রীতিমত যত্ন নিয়ে শাহজাদাকে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়চেতা, সাহসী এবং রণনিপুণ যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলতে লাগলেন। শাহজাদাও নিজের স্বভাবসিদ্ধ গুণে ও পিতার শাসনে দিন দিন একজন আদর্শ নৃপতির গুণাবলী আয়ত্ত করে ক্রমশঃ বড় হতে লাগলেন। যেদিন শিক্ষাগ্রহণের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটত, সুলতান সহজে ক্ষমা করতেন না পুত্রকে।

একদিন প্রধান উজীর কৌতূহলী হয়ে সুলতানকে পুত্রের প্রতি তাঁর এমন কঠোর আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন—'উজির সাহেব! যার হাতে এক সময়ে এই রাজ্যের মঙ্গল-অমঙ্গল আর প্রজাসাধারণের ধন-প্রাণ নির্ভর করবে, তার স্বভাব সৎ, দৃষ্টি সমভাবাপন্ন আর হৃদয় দয়ার আধার করাই আমার এই কঠোর ও কঠিন ব্যবহারের প্রধান কারণ। কারো সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে তাকে কতটা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, শাহজাদা নিজে তার ভুক্তভোগী হলে ভবিষ্যতে সে প্রজাপীড়ক হতে স্বভাবতই কুণ্ঠিত হবে। আমি চাই আমার পুত্র একজন আদর্শ ও জনপ্রিয় নরপতি হয়ে এই বিশাল রাজত্ব ভোগ করুক।'

বস্তুতঃ সেই ব্যাপারই ঘটেছিল। গজনীপতির মৃত্যুর পর শাহজাদা হুসেন যখন সিংহাসনে বসে রাজ্যের শাসনভার হাতে তুলে নিলেন তখন স্বর্গত পিতার প্রতিটি আদেশ উপদেশ আর নির্দেশ মত কাজ করে অচিরেই তিনি পিতার মতই একজন সুশাসক হিসেবে প্রজাসাধারণের অন্তরে নিজের ঠাঁই করে নিতে পেরেছিলেন।

অপরদিকে দিল্লীর সুলতান তৌকিস কিন্তু নিজের পুত্রের শিক্ষা ও সহবতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। একদল বেতনভুক শিক্ষকের হাতে তিনি তাঁর পুত্রের শিক্ষার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। উপরন্তু কোনও দোষ-ত্রুটির জন্য শিক্ষকরা শাহজাদাকে শাস্তি দিলে অথবা তাঁর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বিলক্ষণ রুষ্ট হতেন।
পুত্রের অন্যায়কে বালকসুলভ চপলতা বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন। শাহজাদাকে বিনীত ভঙ্গীতে দেখলে তিনি বিরক্তি বোধ করতেন। বলতেন, এটা নিজের মর্যাদার অবমাননা করা হচ্ছে। এবং আরও নানান ব্যাপারে তিনি শাহজাদার দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেই যেতেই। ফলে শাহজাদা কামরাণ দিনকে দিন উৎসন্নের পথে নেমে চললেন পিতার পরোক্ষ, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উৎসাহ পেয়ে। ক্রমে ক্রমে শাহজাদার অন্যায় এবং অত্যাচারে দিল্লীর প্রজাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হলো। সুলতানের কাছে অভিযোগ জানিয়েও ফল হয় না। কারণ পুত্র তখন পিতার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছে।
প্রায় প্রতিদিন শাহজাদার বিরুদ্ধে তাঁর কৃতকর্মের নালিশ শুনতে

শুনতে সুলতান একদিন বিক্ষুব্ধ হয়ে রেগে গিয়ে শাহজাদাকে সভায় ডেকে এনে খুব করে শাসিয়ে দিলেন। বললেন, তিনি যদি ভবিষ্যতে এইভাবে তার বিরুদ্ধে অনবরত অভিযোগ শোনেন তবে তাঁকে একবস্ত্রে দূর করে দেবেন এ রাজ্য থেকে।
পিতার যাবতীয় ভর্ৎসনা মাথা নীচু করে চুপচাপ শুনে গেলেন শাহজাদা কামরাণ। তাঁর মনে তখন ক্রোধের চাপা আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। রাজসভায় ডেকে এনে এত লোকের সামনে



তাঁকে অপমান করা! এর উপযুক্ত প্রতিফল সুলতানকে পেতেই হবে। এবং অচিরেই। আর অপেক্ষা করা যায় না।
শাহজাদা তার জনকয়েক কুকর্মের সঙ্গীকে নিয়ে মতলব আঁটতে

লাগলেন দিবারাত্র। তারপর একদিন পিতার সঙ্গে শিকার খেলতে বেরিয়ে সুযোগমত হত্যা করলেন তাঁকে।

প্রকৃত তথ্য জেনেও, প্রাণের ভয়ে—অত্যাচারের ভয়ে একজনও কেউ শাহজাদার বিরোধিতা করতে সাহসী হলো না। তিনি বুক ফুলিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে চড়ে বসলেন। তারপর যাদের যাদের নিজের পথের কাঁটা বলে মনে করমেন, দুষ্টবুদ্ধি সঙ্গীদের সহায়তায় তাদেরই একে একে কোতল করলেন। কামরাণের রাজত্বে আবাল বৃদ্ধ-বণিতার সুখে-শান্তিতে থাকবার জো রইল না। এক কথায় দিল্লী হয়ে উঠল এক ঘৃণ্য ও ভয়ংকর নরকের ভূমি।

সহ্যেরও একটা সীমা আছে। রাজ্যের আমীর ওমরাহরা অবশেষে কামরাণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে জোট বাঁধলেন একদিন। তাঁরা বুঝলেন এই দুরাত্মা যতদিন দিল্লীর সিংহাসনে আসীন থাকবে ততদিন করো জীবনে শান্তি বা নিরাপত্তাবোধ বজায় থাকবে না। অতএব যেভাবেই হোক আগে সুলতান কামরাণকে সরাতে হবে দিল্লীর তখন থেকে।

পরামর্শ করে আমীর ও ওমরাহরা স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, এ বিষয়ে গজনীর সুলতানই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। তাঁর কাছেই আবেদন পাঠান যাক দূত মারফতে। তিনি সসৈন্যে এসে দিল্লী দখল করুন। কেউ তাঁকে বাধা দেবে না।

যথা সময়ে দুজন বিচক্ষণ ব্যক্তিতে দূত হিসেবে পাঠানো হলো গজনীর দরবারে। সুলতান হুসেন শুনলেন দিল্লীর যাবতীয় ঘটনাবলী। কিছু কিছু খবর চর মারফতে তাঁর কানেও এসেছিল ইতিপূর্বে। কিন্তু পরের ব্যাপারে তিনি নাক গলাতেন না। এখন আর পাশ কাটিয়ে যাওয়া গেল না। তিনি দিল্লীর

প্রজাদের পীড়নে ব্যথিত হয়ে তাদের সাহায্যে এগোবেন বলে ঠিক করলেন। অতএব গোপনে গজনীর সেনাবাহিনীতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

দিল্লীর সুলতান কামরাণও যে গজনীর আসন্ন আক্রমণের সংবাদ পাননি তা নয় কিন্তু বিলাসী, মদ্যপায়ী, কুচরিত্র কামরণ তা গ্রাহ্যই করলেন না। নিজের ইয়ার বক্সীদের রাজ্যে বিভিন্ন পদে বসিয়েছেন পুরনো রাজকর্মচারীদের সরিয়ে। তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার ওপরেই নির্ভর করে নিশ্চিন্তে আলস্যে দিন কাটাতে লাগলেন। যুদ্ধের কোন প্রস্তুতিই ছিল না। শত্রুপক্ষ যখন দুয়ারে এসে হাজির হলো তখন তাড়াহুড়ো করে যেনতেন প্রকারেণ একটা সৈন্যদল খাড়া করে গজনীর দুধর্ষ সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করতে ছুটলেন তিনি। যা ফল হবার তাই হলো। রাজ্যের জনসাধারণের সহানুভূতি সাহায্য ও আস্থাহীন ছন্নছাড়া দিল্লীর সেনাদল পর্যুদস্ত হয়ে গেল গজনীর সেনাদলের কাছে। সুলতান কামরণ সপারিষদ বন্দী হলেন।

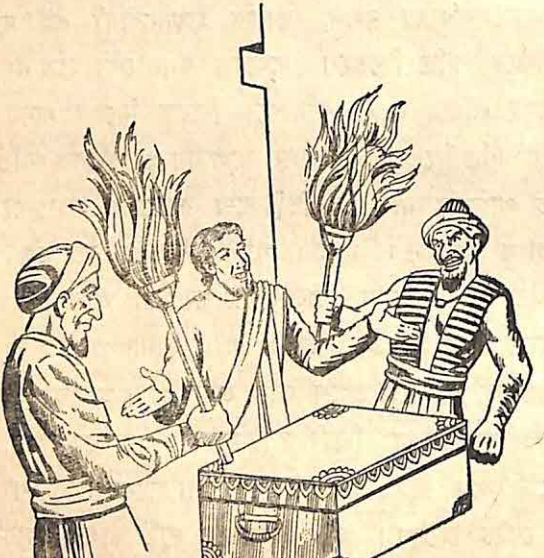
গজনীর সুলতান হুসেমশাহ দিল্লীর সিংহাসন দখল করে বসলেন, যুদ্ধশেষে পরাজিত সুলতানকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় সভায় এনে তাঁর বিচার শুরু হলো। অনেক অনেক অভিযোগ করলেন তাঁর নামে। অবশেষে বিচারে সাব্যস্ত হলো, এমন নৃশংস অত্যাচারী ও অপদার্থ লোককে কারাবদ্ধ করে বাঁচিয়ে রাখার কোন সার্থকতা নেই। অতএব মৃত্যুদন্ডই তার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি। বাদশা হুসেন সেই দণ্ডাজ্ঞাই দিলেন কামরণকে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল জহ্লাদ নিয়ে। পুরনো যে জহ্লাদ ছিল, সে মানবিকতা আর স্নেহের বশে স্বর্গত সুলতানের আত্মজকে বধ

করতে সম্মত হলো না।

পরিশেষে অনেক বলার পর জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবা রাজী হলেন জহ্‌লাদের নিষ্ঠুর কর্ম করতে। এই যুবকের পিতা-মাতাকে বিনা কারণে হত্যা করেছিলেন কামরণ। তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। সে সব দুঃখ ভোলেনি যুবক। তাই সে এগিয়ে এলো ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে।

বাদশা হুসেন তার হাতেই তুলে দিলেন কামরণকে। যুবক বন্দী সুলতানকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে। পেছনে পেছনে অগণিত দর্শক। যুবক বধ্যভূমিতে গিয়ে প্রথমেই তীক্ষ্মমুখ শলাকার সাহায্যে কামরণের চোখ দুটি উপড়ে নিল। তারপর দর্শকদের বলল, তাদের ইচ্ছানুযায়ী এই দুরাত্মা পাপিষ্ঠকে শাস্তি দিতেই। যুবকের কথা শেষ হতে না হতেই অনেকেই এগিয়ে এলো কামরণকে নিজের নিজের মনের আশা মিটিয়ে শাস্তি দিতে। হতভাগ্য সুলতান এই সমবেত শাস্তি সহ্য করতে পারলেন না। অনতিবিলম্বে রক্তাক্ত ও আহত কলেবরে প্রাণত্যাগ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে সকলের দয়াভিক্ষা করে সকাতরে বলে গেলেন—'প্রজাগণ! তোমরা আমাকে আমার কৃতকর্মের উপযুক্ত দণ্ডই দিয়েছ। এটাই আমার প্রাপ্য ছিল। যে অপরাধ করেছি অজ্ঞাতবশে তার জন্য এখন অনুতাপ হচ্ছে। অতঃপর গজনী এবং দিল্লী দুটি রাজ্যকে এক করে দক্ষতা এবং সুনামের সঙ্গে রাজত্ব করে গেলেন বাদশা হুসেন। আশী বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর সুশাসনে দুটি রাজ্যই ধনে-জনে কৃষিসম্পদে-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিল।

অশ্বপাল সাদিক ও উজীর নন্দিনীর গল্প



তাতার দেশে তৈমুর খাঁ নামে এক নৃপতি ছিলেন। তাঁর সুশাসনে প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে সে রাজ্যে বাস করছিল। সুলতান তৈমুরের একটি বিশেষত্ব ছিল। তিনি সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের খুবই সমাদর করতেন। তিনি নিজেও পরম সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাই রাজ্যের মধ্যে সত্যবাদী ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে বার করে তাদের যথাযোগ্য পুরস্কৃত করতেন। এমনি একটি লোকের নাম সাদিক। সে নাকি কথা বলতে শিখে অবধি আজ পর্যন্ত একটিও মিথ্যে কথা বলেনি।



সুলতান তৈমুর তাকে পরম আদরে রাজসভায় ডেকে এনে নিজের অশ্বশালার অধ্যক্ষ করে দিলেন। এবং নানান ব্যাপারে পরীক্ষা

করে তার সত্যনিষ্ঠার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে একান্ত মুগ্ধ হলেন।

হঠাৎ একজন পথের লোককে সুলতানের প্রিয়পাত্র হতে দেখে অন্যান্য ওমরাহদের চোখ টাটাল। তাঁরা সাদিককে ঈর্ষা করতে শুরু করলেন এবং সচেষ্ট হলেন কিভাবে সাদিককে সুলতানের চোখে হেয় করা যায়। কিন্তু সুলতান তৈমুর কারো মুখের কথায় নির্ভর করতেন না বা কারো বিবেচনার ধার ধারতেন না। তাই আমির ওমরাহরা সাদিকের নামে কুৎসা রটনা করে সহজে কিছু সুবিধে করতে পারলেন না।

ষড়যন্ত্রকারী ওমরাহদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উজির তায়েবউদ্দীন। দিন দিন সুলতানের কাছে সাদিকের আধিপত্য লক্ষ্য করে তিনি হিংসায় এবং ক্রোধে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলেন। সাদিককে হেয় প্রতিপন্ন করতে না পেরে মনের দুঃখে তিনি ক্রমশ কৃশ, দুর্বল ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। তায়েবউদ্দিনের পরমা সুন্দরী একটি কন্যা ছিল। পিতার দেহ ও মনের ক্রমাগত অবনতি লক্ষ্য করে একদিন সে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল।

তায়েবউদ্দিন তখন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'দুঃখের কথা তোমায় আর কি বলব মা, আমার মত মন্দভাগ্য বুঝি পৃথিবীতে আর কেউ নেই। নইলে এতদিনে প্রাণপণে চেষ্টা করেও সুলতানের প্রিয়পাত্র হতে পারলাম না কেন? আর কোথায় কে এক সাদিক, সেদিন এসেই কিনা সুলতানের নয়নের মণি হয়ে উঠল। আমি অনেক চেষ্টা করে দেখলাম, প্রভুর মন তার ওপর থেকে টলাতে পারলাম না। তাই ক্ষোভে অপমানে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এর চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।'

হোসেনী নীরবে পিতার কথা শুনে গেল। তারপর তাঁর মনো-

ভাব বুঝে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত হোন বাবা। আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোন উপকার হয় তো সে কাজ যত নীচই হোক না কেন, আমি করতে রাজী আছি। আপনি যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, কে বলতে পারে আমি সেখানে সফল হবো না। সাদিকের সর্বনাশের ভার আপনি আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।'

—'তুমি পারবে মা?' তায়েবউদ্দিনের চোখে আশার আলো।

—'আপনার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই পারব বাবা।'

তায়েবউদ্দিন খানিকক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করলেন কন্যার কথাগুলি। তারপর সব দ্বিধা-সংকোচ দূর করে খোলা মনে বললেন, 'বেশ, আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি যেভাবে পার তাকে ধ্বংস কর। কোন কিছুর জন্যই কুণ্ঠিত হয়ো না। তোমায় সর্ববিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া রইল।'

পিতার অনুমতি পেয়ে, নিজের মহলে গিয়ে হোসেনী প্রথমে নিজের কার্যপ্রণালী ঠিক করে নিল। তারপর সাজতে বসল। সাজগোজ শেষ হলে হোসেনী এরপর নিজের জনকয়েক সহচরীকে নিয়ে একটু গভীর রাত্রে যাত্রা করল সাদিকের বাসভবনের দিকে। সেখানে পেঁছে সঙ্গিনীদের বিদায় দিয়ে সে সাদিকের ঘরের দরজায় মৃদু করাঘাত করল।

সাদিক তখনও ঘুমোয়নি। নানাকাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। রাত গভীর তাই দাস-দাসীরাও নিদ্রায় আচ্ছন্ন। দুয়ারে করাঘাতের শব্দ শুনে অগত্যা সাদিককেই উঠতে হলো তা দেখতে।

হোসেনীকে দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

দুচোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল রমণীর রূপ এবং অলঙ্কারের ছটায়! মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না।

সাদিকের বিহ্বল অবস্থা লক্ষ্য করে হোসেনী মনে মনে খুব খুশী হলো। তার প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সাদিক তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

সুন্দরী হোসেনী এবার ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করল। সাদিককে মধুর কণ্ঠে জানাল যে, সে সাদিকের সাধুতা আর সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে। এর আগে সাদিককে সে দেখেছে নিজের ঘরের জানালা থেকে। যাই হোক, অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে হোসেনীকে সে সাদরে নিয়ে গেল নিজের উপবেশনকক্ষে।

গল্প করতে করতে এক সময়ে হোসেনী ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'বন্ধু, বড় ক্ষুধা পেয়েছে আমার। কিছু খাওয়াবে?'

সাদিক ব্যস্ত আর অস্থির হয়ে উঠল হোসেনীর কথায়। তাই তো, কী পানভোজন করিয়ে এখন এই সুন্দরীকে পরিতুষ্ট করবে সে? তাকে চিন্তিত দেখে হোসেনী মধুর হেসে জানাল: 'জানো বন্ধু, অনেকদিন ধরেই ঘোড়ার মাংস আর ঘোড়ার হৃৎপিণ্ড খাওয়ার সাধ হয়েছে আমার। তুমিতো সুলতানের অশ্বপাল। তুমি পারবে না আমার এই ছোট্ট সাধটুকু মেটাতে?'

সাদিক কুণ্ঠিত স্বরে জবাব দিল, 'তোমার এই সামান্য সাধটুকু মেটানো আমার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। তবে কি জান, প্রভুর গচ্ছিত ধন প্রাণপণে রক্ষা করাই ভৃত্যের একমাত্র কর্তব্য কর্ম'। তাই—সাদিক একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কিন্তু আজ বরং তুমি অন্য কিছু দিয়ে তোমার ক্ষুধা মেটাও। আমি আগামী কাল সকালেই তোমার জন্য একটি ভাল দেখে ঘোড়া বাজার থেকে কিনে এনে তার মাংস রেঁধে রাখব—তুমি কাল রাত্রে সেই মাংস খেয়ে তোমার

সাধ মিটিও, কেমন ?'

হোসেনী বলল, 'বাজার থেকে ঘোড়া কিনে এনে তার মাংস রান্না করে খাওয়ার সামর্থ কি আমার নেই ? সে কথা নয়। আমার সাধ হয়েছে সুলতানের অশ্বশালার একটি ঘোড়ার মাংস খেতে। তুমি আমার সেই সাধ পূর্ণ করতে পারবে কিনা তাই বল।'

সাদিক শিউরে উঠল এই কথায়। সভয় বলল; 'আমি জীবন থাকতে আমার অন্নদাতা প্রভুর অনিষ্ট সাধন করতে পারব না। তিনি তাঁর অশ্বশালার একটি ঘোড়া কম কেন জিজ্ঞাসা করলে আমি কী উত্তর দেব ? তিনি সত্য উত্তর শুনলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণদন্ডের আদেশ দেবেন। তাই কি তোমার অভিপ্রায় ?'

হোসেনী সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল; 'প্রাণদন্ডই যে দেবেন এমন কথাই বা তুমি ভাবছ কেন ? তাছাড়া সত্য উত্তরই বা দেবার প্রয়োজন কী ? সুলতান জিজ্ঞাসা করলে তুমি মিথ্যে করে বলবে যে, ঘোড়াটার অসুখ করেছিল। তুমি তাকে রোগমুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টাই করেছিলে কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রোগগ্রস্ত ঘোড়া অশ্বশালায় থাকলে ক্রমে ক্রমে সব ঘোড়ারই ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ভেবে, তুমি নিজের দায়িত্বে সেটিকে বধ করেছ। – ব্যাস ! সুলতান জানেন তুমি কখনও মিথ্যা কথা বলো না, তাই তোমার এই প্রথম মিথ্যাভাষণকে তিনি সত্যভাষণ বলেই বিবেচনা ক'রে তোমায় শাস্তির হাত থেকে রেহাই দেবেন। তখন আর কি ! তুমিও প্রাণে বাঁচলে আর আমারও ছোট্ট সাধটুকু মিটল।'

উভয় সংকটে পড়ে গেল সাদিক।

অবশেষে হোসেনীর অনুরোধই জয়যুক্ত হলো। সাদিক সম্মত

হলো হোসেনীর অভিলাষ পূরণ করতে।

অতঃপর অশ্বশালায় প্রবেশ করে হোসেনী যে ঘোড়াটিকে পছন্দ করল সেটি আবার সুলতানের সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া। আবার মহা দ্বিধায় পড়ে গেল সাদিক। হোসেনীকে পুনরায় অভিনয় করতে হলো। সে জানালো, সাদিক যদি তার এই সামান্য অনুরোধটুকু না রাখে তবে সে মনের দুঃখে নিজের বুকে নিজে ছুরি মেরে এখনই প্রাণত্যাগ করবে।

অগত্যা সাদিককে এ ঝুঁকিও নিতে হলো।

ঘরে ফিরে পিতার কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা যথাযথ বর্ণনা করল হোসেনী। শুনে তো তায়েবউদ্দিন আহলাদে আটখানা। তিনি তক্ষুণি রাজসভায় গিয়ে সুলতানের কাণে তুলে দিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত। শুধু এর পেছনে যে তাঁর নিজের অশুভ হাত রয়েছে, সে কথা আর খুলে বললেন না।

একদিকে হোসেনী বাড়ী ফিরে যাবার পর সাদিকের বিবেক-দংশন উপস্থিত হলো। অনুতাপের অনলে সে পুড়তে লাগল। তার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। এখন উপায়! জীবনে কখনো সে মিথ্যে বলে না বলেই তার ওপরে সুলতানের অগাধ আস্থা।

মাথা চাপড়াতে লাগল সাদিক। হায়, আমি কি হতভাগ্য। রমণীর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে যেমন অবিশ্বাসের কাজ করেছি তার সমুচিত শাস্তি এবার আমায় পেতে হবে। ধিক! আমার মত রূপমুগ্ধ পুরুষের জীবনে।

এইসব ভাবছে সাদিক এমন সময় জনৈক প্রহরী এসে জানাল ঃ সুলতান তাঁকে এত্তেলা পাঠিয়েছেন।

মুখ শুকিয়ে গেল সাদিকের। সে বুঝল তার অন্তিম সময় এবার ঘনিয়ে আসছে। কোনক্রমে প্রহরীকে বলল; 'ঠিক আছে; তুমি যাও, আমি এখনই প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছি।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আর আল্লার নাম জপতে জপতে রাজসভায় যথাসময়ে উপস্থিত হলো সাদিক। তাকে দেখে সুলতান বললেন; 'সাদিক! আমার 'কালাবাজ' কে তৈরী রাখ। আজ আমি শিকারে বেরোব স্থির করেছি।'

সাদিক আর সাদিকের মধ্যে নেই। সে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল এবং বাকশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে।

সুলতান জলদগম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় বললেন; 'কি; আমার আদেশ শুনতে পাওনি? যাও আমার ঘোড়া তৈরী করে আন।'

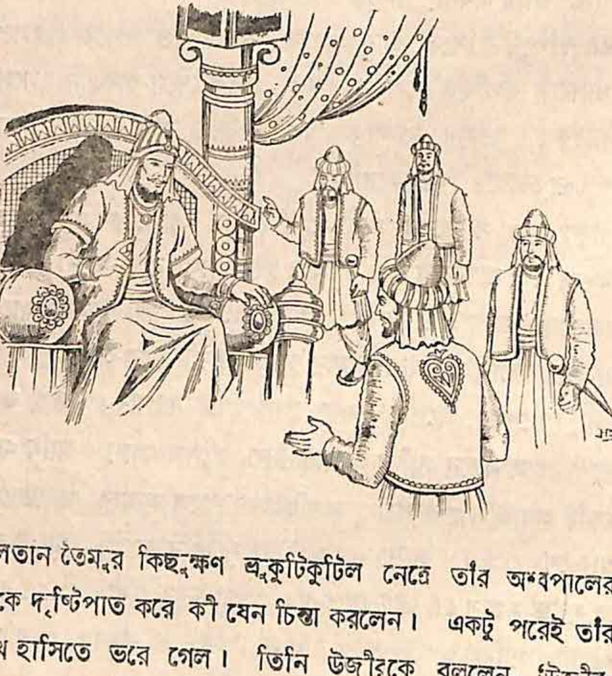
উত্তর না দেওয়া অশোভন এবং গোস্তাখির ব্যাপার। তাই অতি কষ্টে সজল নয়নে সাদিক জবাব দিল, 'খোদাবন্দ! আমি এমন একটি অমার্জনীয় অপরাধ করেছি যার ফলে আমার অনুতাপের আর শেষ নেই। আমি অকপটে সব স্বীকার করব। খোদাবন্দের যে শাস্তি মঞ্জুর হয় তাই দেবেন। তবু মিথ্যা বলতে পারব না।'

এই বলে সাদিক একটি বর্ণও বাদ না দিয়ে গত রাত্রের ঘটনাবলী হুবহু নিবেদন করল সুলতানের কাছে।

মুখ গম্ভীর করে সব শুনলেন সুলতান। তারপর তিনি প্রধান উজীর তায়েবউদ্দিনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'এই অপরাধের শাস্তি কি উজীর সাহেব?'

তায়েবউদ্দিনের আনন্দ দেখে কে। আজ সাদিক মিয়াকে বাগে

পাওয়া গেছে। এ কাঁটা উপড়ে ফেলাই মঙ্গল। এই ভেবে মনের উল্লাস মনে চেপে রেখে তিনি বিজ্ঞের মত দাড়ি চুমরে জানালেন ঃ 'বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি—মৃত্যুদণ্ড খোদাবন্দ।'



সুলতান তৈমুর কিছুক্ষণ ভ্রূকুটিকুটিল নেত্রে তাঁর অশ্বপালের দিকে দৃষ্টিপাত করে কী যেন চিন্তা করলেন। একটু পরেই তাঁর মুখ হাসিতে ভরে গেল। তিনি উজীরকে বললেন, 'উজীর-সাহেব! এটাই সাদিকের প্রথম অপরাধ। এর আগে আর কখনও কোন অপরাধ করেনি সে। অতএব আমার বিবেচনায় এযাত্রা তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই উচিত।'

এই বলে সুলতান সাদিকের দিকে চেয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'সাদিক! আমি তোমার সরলতায় আর নির্ভেজাল সত্যভাষণে

খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার মত অবস্থায় পড়লে আমি শুধুমাত্র একটি ঘোড়া কেন; তামাম দৌলৎখানাই লুটিয়ে দিতাম সেই সুন্দরী বান্ধবীর জন্যে। যাও সাদিক; আমি এবারকার মত তোমায় মাফ করলাম আর প্রাণের ভয় থাকা সত্ত্বেও সত্যভাষণে বিরত না থাকার জন্য এই নাও তোমার পুরস্কার।' সুলতান নিজের হাতের একটি বহুমূল্য আংটি খুলে বাড়িয়ে ধরলেন সাদিকের দিকে।

সাদিক এবং উজীর তায়েবউদ্দিন কেউই বিচারের এই অপ্রত্যাশিত ফলাফল আশা করেনি। সাদিক, সুলতানের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বার বার চুম্বন দিতে থাকল।

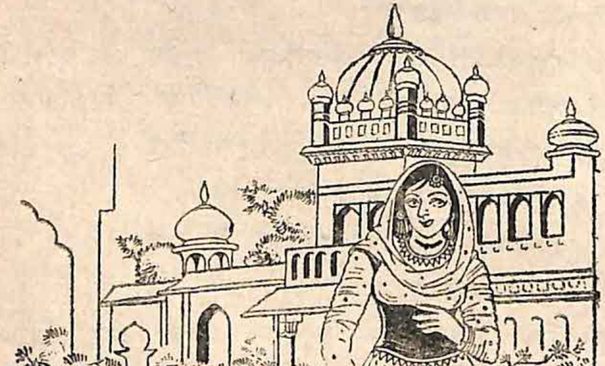
সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, 'সাদিক সেই মেয়েটির কোন নিশানি আছে তোমার কাছে?'

সাদিক তার পোষাকের ভেতর থেকে একটি কারুকার্য করা হারের লকেট বের করে দিল সুলতানকে। বলল, 'হুজুর; এটা সে ভুল করে ফেলে গেছে।'

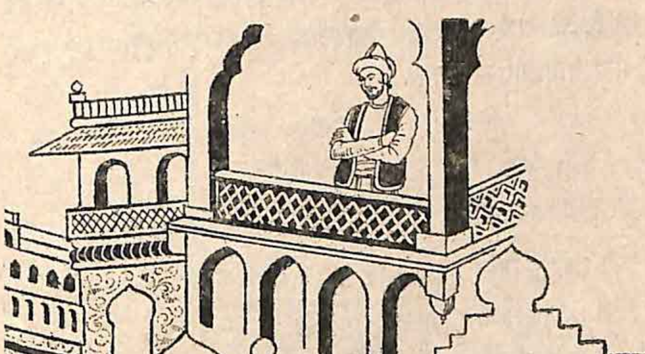
লকেট দেখেই চিনতে পারলেন সুলতান। কারণ এই লকেটটাই তিনি উজীরের মেয়ের জন্মদিনে তাকে উপহার দিয়েছিলেন। কঠোর দৃষ্টিতে উজীরের দিকে তাকালেন তিনি। এযে তাঁরই চক্রান্ত তা অনায়াসে বুঝতে পারলেন সুলতান।

হতাশার সাগরে আপাদমস্তক ডুবে গেলেন তায়েবউদ্দিন। শত্রু তো নিপাত হলোই না উপরন্তু নিজের সম্মান এবং সম্ভ্রম টুকুও নষ্ট হলো এই চক্রান্তে। এরপর আর বেশীদিন বাঁচেননি উজীর। তাঁর মৃত্যুর পর সাদিককেই সেই পদ দিলেন সুলতান তৈমুর।

পোষ্যপুত্র ও রাজকুমারী



একবার একজন সওদাগর দেশভ্রমণে ইচ্ছুক হয়ে পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ যাত্রা করলেন। বেড়াতে বেড়াতে তাঁদের বেড়াবার নেশা এমনই বেড়ে গেল যে, তাঁরা ক্রমে দূর দূর দেশেও যাত্রা শুরু করলেন। এইভাবে তাঁরা এসে পড়লেন আজমীরে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে এক দস্যু তাঁদের পিছু নিল। তারপর এক নির্জনস্থানে পেয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই সবলে বন্দী করে নিয়ে গেল নিজের গুপ্ত আস্তানায়। এবং সওদাগরকে বাধ্য করল তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে পত্র দিয়ে বন্দীমুক্তির জন্য মোটা টাকা পাঠাবার অনুরোধ জানাতে।



যথাসময়ে টাকা এলো। টাকা পেয়ে দস্যু মুক্তি দিল সওদাগর আর তাঁর স্ত্রীকে।

সওদাগর তাঁর আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে নিয়ে সেই অচেনা অজানা প্রদেশে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে অবশেষে একটি নগরীতে এসে উপস্থিত হলেন। এবং সরাইখানায় স্থান নিলেন।

সেইদিন রাত্রেই সওদাগরের পত্নী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু! এই সন্তানের উপায় কী হবে?'

সওদাগর তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, 'এই শিশুকে নিয়ে পথে পথে কোথায় ঘুরব আমরা? দাও, একে কোথাও রেখে আসি।'

সওদাগরের স্ত্রী সন্তানটিকে মাতৃ-মমতায় সহজে ছেড়ে দিতে চাইলেন না। সওদাগর অনেক রকমে বুঝিয়ে, সমাজের ভয় দেখিয়ে, শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে, শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলেন এবং রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাকে এক মন্দিরের সিঁড়িতে শুইয়ে রেখে পরের দিন সকালেই সস্ত্রীক সেই সরাই খানা পরিত্যাগ করলেন।

সেই দেশের যিনি রাজা, তাঁর প্রতিদিন প্রভাতে নগর-ভ্রমণের শখ ছিল। বেড়াতে বেড়াতে তিনি সেই মন্দিরের কাছে এসে সদ্যো-জাত শিশুটিকে দেখতে পেলেন। তাঁর মনে দয়া ও করুণার উদ্রেক হলো। তাঁর নিজের কোনও সন্তান ছিল না তাই একটি

সন্তানের জন্য রাজা বড়ই কাতর ছিলেন। অসহায় শিশুটিকে দেখে তাঁর পিতৃহৃদয় কেঁদে উঠল স্নেহ-মমতায়। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে নেমে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

রাজপুরীতে আদরে-যত্নে লালিত পালিত হতে লাগল সেই শিশু। তার যখন পাঁচ বছর বয়স হলো রাজা তাকে বিধিসম্মত ভাবে পোষ্য নিলেন। রাজপুত্র নানান অস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা শিখতে লাগলেন পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে। ক্রমে ক্রমে বিবিধ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠলেন। রাজা ও রাণীর আনন্দের সীমা রইল না। রাজ্যের একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উঠলেন কুমার।

যদিও পোষ্য নেবার কিছুদিন পরেই রাণী সন্তানসম্ভবা হলেন এবং দশমাস দশদিন পরে পরম রূপবতী এক কন্যার জন্মদান করলেন তবুও রাজকুমারের আদর বা যত্ন তাতে কিছুমাত্র হ্রাস পেল না রাজা ও রাণীর কাছে। প্রজাপুঞ্জ কুমারের গুণে আর সৈন্যবাহিনী কুমারের শৌর্য-বীর্যে তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

একই সঙ্গে বড় হয়েছিল দু'জনে। কুমার তাকে নিজের ভগ্নী বলে জানলেও রাজকুমারীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি তাঁর মনোভাব একটু একটু করে বদলে গিয়ে তাকে বিবাহের জন্য অভিলষিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রে অচল। তা যত দূরের সম্পর্কই হোক না কেন। ফলে রাজকুমার মনে মনে বড়ই কাতর হয়ে পড়লেন।

এদিকে রাজা ও রাণী মেয়ে সাবালিকা হয়েছে দেখে তার বিবাহের

জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দেশে দেশান্তরে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের কাছে দূত পাঠান হলো। এবং এক রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকুমারীর সম্বন্ধও স্থির হয়ে গেল।

কুমারের মনে সুখ নেই শান্তি নেই সর্বদাই জ্বালা। মনের খেদ আর ক্ষোভ মনেই চেপে রাখেন, কাউকে প্রকাশ করে বলতে পারেন না। কারণ এ অন্যায়; এ পাপ, এ অসম্ভব। যে শুনবে সেই ছি ছি করবে, ধিক্কার দেবে। পিতা-মাতা শুনলে তো নির্বাসনেই পাঠাবেন কুমারকে।

কিন্তু রাজকুমারীকে পাওয়ার চিন্তায় তিনি ক্রমেই হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়লেন।



নিজের বাসনাকে যখন আর কোন মতেই দমন করা গেল না; কুমার

তখন নিজস্ব কিছু অনুচরের সাহায্যে রাজকুমারীকে একদিন অপহরণ করে রাজধানী ছেড়ে পালালেন।

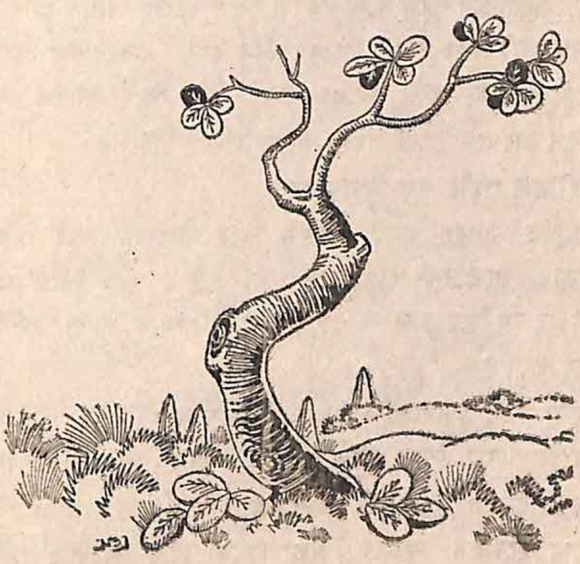
পরদিন প্রভাতে রাজকুমারীর অপহরণ এবং কার দ্বারা অপহৃত—এ সংবাদ পেয়ে রাজা ও রাণী স্তম্ভিত; দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁদের তো বটেই প্রজাসাধারণেরও কোন সহানুভূতিই রইল না আর কুমারের ওপরে। রাজা চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। রাজ্যের বাইরে এক বিশাল প্রান্তরে দেখা হলো পিতা-পুত্রে। তুমুল যুদ্ধ হলো। কিন্তু তরুণ রাজকুমারের রণ চাতুর্যের কাছে বৃদ্ধ রাজা পরাজিত হলেন। কুমার নির্দ্বিধায় তাঁর পালক পিতাকে বধ করে রাজ্য দখল করলেন।

একদিন যাকে পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে নিজের সন্তানের আসনে বসিয়েছিলেন রাজা; সেই অকৃতজ্ঞ আর খল পোষ্য পুত্র শেষ পর্যন্ত বিবেক ধর্ম সব জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের পালক পিতাকেই হত্যা করল।

দর্জী ও রূপসী গোলেন্দাম



অনেক কাল আগে তুরাণ দেশে আবু তাহের নামে এক সুদক্ষ দর্জী বাস করত। তার পত্নী ছিল অতীব সুন্দরী। নাম গোলেন্দাম। দর্জী প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসত তার স্ত্রীকে। এক মুহূর্তের বিরহও সহ্য হতো না তার। স্ত্রীরও তাই। খুবই সুখে ছিল তারা। আবু তাহের একদিন গোলেন্দামকে কথাপ্রসঙ্গে বলল, 'খোদা না করেন, যদি তুমি আমার আগে মারা যাও তবে আমি শপথ করে বলছি যে, পুরো এক সপ্তাহ আমি তোমার কবরের ওপর মাথা রেখে অনশনে শোক করব।'



উত্তরে গোলেন্দামও জানাল—'স্বামী! আমিও শপথ করে বলছি, তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তাহলে আমি অনশনে ও শোকে তোমার কবরে মাথা রেখেই মৃত্যুকে বরণ করে নেব। তবু তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করব না।'

দুজনেই দুজনের কথায় খুব সন্তুষ্ট হলো। কালক্রমে গোলেন্দামেরই আগে মৃত্যু হলো। আবু তাহেরের দুঃখের অবধি রইল না। নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ল। সে স্ত্রীকে কবর দিয়ে তার কবরে মাথা রেখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে শোক প্রকাশ করতে লাগল।

মহামতি কায়েস ছিলেন সেদেশের এক মহাবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত। সেদিন কোনও কাজে তিনি সেই কবরখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় তাঁর কানে এলো দর্জীর করুণ কণ্ঠের বিলাপ-ধ্বনি। কৌতূহলী এবং করুণাবশতঃ তিনি সেই কবরখানায় প্রবেশ করে দর্জীকে একটি কবরের উপর মাথা রেখে কাঁদতে দেখে —সে কার জন্য শোক প্রকাশ করছে জানতে চাইলেন।

দর্জী তার পত্নীর কথা উল্লেখ করল।

মহামতি কায়েস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'সবই আল্লার ইচ্ছা। এতে দুঃখ করে লাভ নেই, ভাই। ঘরে ফিরে যাও। আবার মন দিয়ে কাজ কর্ম শুরু কর। দেখবে সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু আবু তাহেরের কান্না তাতে থামে না।

কায়েস তখন স্মিত হেসে বললেন, 'ভাই, আর তোমায় শোক করতে হবে না। তোমার পত্নী-প্রেমের পরিচয় পেয়ে আমি বিশেষ মুগ্ধ হয়েছি। আমার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে আল্লার মেহের-

বাণীতে। উঠে এস। আমি তোমার স্ত্রীকে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

এই বলে মহামতি কায়েস ত্রিভুবনের জনক, পালক ও সংহার কর্তা ঈশ্বরের নাম নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে, নিজের অত্যাশ্চর্য অলৌকিক শক্তির প্রভাবে দর্জী-পত্নীর মৃতদেহে আবার জীবন সঞ্চার করলেন।

গোলেন্দাম নিজেকে পুনর্জীবিত দেখে খুবই অবাক হলো। স্বামীর মুখে নিজের পুনর্জীবন লাভের আশ্চর্য বৃত্তান্ত শুনে তার বিস্ময় আরও বহুগুণে বেড়ে গেল। সে বার বার ঈশ্বরকে, সেই মহান আগন্তুককে আর স্বামীকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

দর্জী বলল, 'চল, এবার আমরা ঘরে ফিরে যাই।'

—হ্যাঁ, তাই চল। কিন্তু—'উঠতে গিয়েও থেমে গেল গোলেন্দাম। স্বামীকে নিজের শরীরের দিকে ইঙ্গিত করে লজ্জিত কণ্ঠে জানালঃ 'এভাবে মৃতের পোষাক পরে পথ দিয়ে হাঁটব কি করে?'

দর্জী তখন তাকে সেইখানেই অপেক্ষা করতে বলে ছুটে চলে গেল বাড়ীতে পত্নীর জন্য পোষাক আনতে।

দর্জী চলে যাবার একটু পরেই যে কোন কারণেই হোক সেইখান দিয়ে অশ্বারোহণে যাচ্ছিলেন সে রাজ্যের শাহজাদা। রূপসী গোলেন্দামকে দেখতে পেলেন তিনি। এই নির্জন কবরখানায় একজন সুন্দরী রমণীকে একাকিনী এইভাবে বসে থাকতে দেখে শাহজাদা যারপরনাই অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন কোন হুরী বা জিন নয় তো! কৌতুহল চাপতে না পেরে সাহসে ভর করে তিনি গোলেন্দামের কাছে এগিয়ে গেলেন।

সুন্দরী গোলেন্দামও দেখেছিল শাহজাদাকে। আহা, কী রূপ!

কী বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা! কী দামী পোষাক! অবশ্যই ইনি কোনও আমীর অথবা ওমরাহ হবেন। হায়! আমি যদি এঁর স্ত্রী হতাম তবে কত সুখেই না দিন কাটাতে পারতাম। অভাব বলে আর কিছু থাকত না।

শাহজাদা এসে জিজ্ঞাসা করলেন; 'তুমি কে? থাক কোথায়?'

গোলেন্দাম স্মিত হেসে উত্তর দিল, 'আমার নাম গোলেন্দাম, আমি এই নগরেই থাকি।'

—'এখানে একাকী কি করছ?' পুনরায় প্রশ্ন করলেন শাহজাদা।

—'এক আত্মীয়ের কবরে ফুল দিতে এসে দুর্ভাগ্যক্রমে এক দস্যুর হাতে পড়ি। দস্যু আমার পোষাক আর অলংকারাদি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আল্লার কৃপায় আপনি এসে পড়ায় সে আমার আর কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। আমি রমণী; এ অবস্থায় কিভাবে ঘরে ফিরব? তাই ফিরতে পারছি না।

শাহজাদা একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার স্বামী নেই?'

গোলেন্দামের মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম দুষ্টামির হাসি হেসে উত্তর দিল—'না।'

শাহজাদা ভাবছিলেন; একে তাঁর মহলে নিতে পারলে ভারী চমৎকার হয়। এখন গোলেন্দামের উত্তর শুনে তাঁর মনে যেটুকু দ্বিধা ও সংশয় ছিল সেটুকু উবে গিয়ে আনন্দের বান ডাকল। তিনি সাগ্রহে বললেন; 'সুন্দরী! আমি এই রাজ্যের শাহজাদা। তোমায় দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি তোমায় বিবাহ করতে চাই। তুমি কি রাজী আছ?'

গোলেন্দামও তাই চাইছিল মনে মনে। কিন্তু সহজে স্বীকৃতি

দিলে নিজের মূল্য কমে যাবে বিবেচনা করে খানিকক্ষণ টালবাহনার পর অবশেষে রাজী হয়ে পড়ল।

শাহজাদা তাকে নিজের ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলেন।

এদিকে দর্জী আবু তাহের বাড়ী এসে তার বিবির সবচেয়ে প্রিয় পোষাকটি নিয়ে আবার কবরখানায় ফিরে গিয়ে গোলেন্দামকে না দেখে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। পাগলের মত আনাচে-কানাচে খোঁজা-খুঁজি করল। কিন্তু হা-হতোস্মি! সারা কবরখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও স্ত্রীর চুলের বিনুনির পাত্তা অবধি পেল না



কোথাও। তার বড় ভয় হলো। শুনেছে, কবরখানায় ভুত বা জিন থাকে। একা সুন্দরী স্ত্রীলোককে পেয়ে তাদেরই কেউ উড়িয়ে নিয়ে গেল না তো তাকে।

চিরতরে হারিয়ে ফেলা পত্নীকে খোদার ফজলে ফিরে পেয়ে আবার হারিয়ে ফেলে দুঃখে কাঁদতে বসল দর্জী।

যাই হোক বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে থামল সে। তার মনে এবার আর এক নতুন চিন্তার উদয় হলো। সে ভাবল, এ কাজ জিন বা ভূত-প্রেত না হয়ে কোন বদমাইস লোকেরও তো হতে পারে। হায় হায়, না জানি গোলেন্দাম কত না কষ্ট পাচ্ছে; কত না কাঁদছে। যে করেই হোক, তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। নিজের ক্ষমতায় না কুলোলে রাজপুরুষদের সাহায্যে তাকে সেই দুর্বৃত্তের কবল থেকে মুক্ত করে আনবে সে।

পুরো একটি সপ্তাহ ধরে দর্জী তার স্ত্রীকে খুঁজে বেড়াল আতি পাতি। কিন্তু কোথাও না পেয়ে হতাশ মনে যখন পথের একধারে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য মনে মনে বিলাপ করছে; সেই সময় তার জনৈক পরিচিত ব্যক্তি এসে তাকে খবর দিল যে, গোলেন্দাম সুলতানের প্রাসাদে রয়েছে।

শুনেই লাফিয়ে উঠল আবু তাহের। তারপর সংবাদদাতাকে বহু ধন্যবাদ জানিয়ে তখনই ছুটল প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদে পেঁছে নিজের অভিযোগ জানাল সুলতানকে।

সুলতান এই অভিযোগে যেমন ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হলেন তেমনই আশ্চর্য বোধও করলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলেন শাহজাদাকে। শাহজাদা এলেন। অভিযোগ শুনে তাঁরও ক্রোধ ও বিস্ময়ের সীমা রইল না। বললেন, 'যুবক! ভেবে চিন্তে কথা বল।

আমি এ রাজ্যের শাহজাদা। তুমি যদি তোমার অভিযোগ সপ্রমাণ করতে না পার তবে বিশেষ শাস্তি পেতে হবে তোমাকে। এ কথায় আবু তাহের কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'শাহজাদা! আমি সাচ্চা খবর পেয়েই এখানে ছুটে এসেছি। আমার বিবি আপনার হারেমেই আছে। আপনি তাকে ফিরিয়ে দিন।'

এবার সুলতান বললেন, 'যুবক! তুমি অতি গুরুতর অভিযোগ এনেছ শাহজাদার বিরুদ্ধে। আমি এ দেশের সুলতান। আমার কর্তব্য সুবিচার করা। বেশ, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি তুমি হারেমে ঢুকে তোমার বিবিকে খুঁজে নাও।'

দর্জী সানন্দে রাজি হলো।

অতঃপর এক বিশেষ সংরক্ষিত কক্ষে সুলতানের আদেশে শাহজাদার হারেমের মহিলারা একে একে এসে দর্শন দিতে লাগলেন আবু তাহেরের সামনে। স্বয়ং সুলতান এবং শাহজাদাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। অগত্যা গোলেন্দামকেও আসতে হলো দর্জীর কাছে। তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল সে। উত্তেজিত কণ্ঠে গোলেন্দামকে দেখিয়ে বলল, 'এই তো, এই তো আমার পত্নী গোলেন্দাম! এরই খোঁজে গত সাতদিন ধরে আমি পথে পথে ছুটে বেড়িয়েছি।'

শাহজাদা সপ্রশ্ন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন গোলেন্দামের দিকে। গোলেন্দাম কাতর স্বরে বলল, 'শাহজাদা! এ তো সেই দস্যু। যে আমার পোষাক আর অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে আমায় একাকী অসহায় অবস্থায় সেই কবরখানায় ফেলে পালিয়েছিল। এ লোক মিথ্যাবাদী। এখন আবার নতুন মতলবে এখানে এসে হাজির

হয়েছে। এর একটি কথাও বিশ্বাস করবেন না। আপনি এই দুর্বৃত্তকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিন এই মুহূর্তে।'

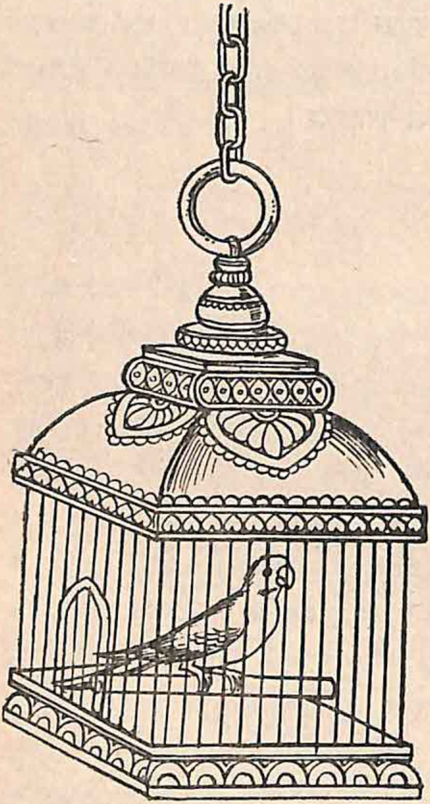
স্ত্রীর কথা শুনে তো দর্জী হতবাক! ক্ষোভে, বেদনায়, প্রতারণায় তার মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। তাই দেখে শাহজাদা ভুল বুঝলেন। ভাবলেন, গোলেন্দাম তবে সত্যি কথাই বলছে। তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে আবু তাহেরকে একজন প্রহরীর জিম্মা করে বধ্য ভূমিতে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘাতক যখন দর্জীকে ফাঁসিকাঠে তুলে তার গলায় ফাঁস পরাবার ব্যবস্থা করছে তখন তার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। তাই ব্যবস্থা করতে একটু সময় লাগছিল ঘাতকের। এমন সময় সেখানে এলেন মহামতি কায়েস। জনতার ভীড় দেখে কৌতুহলী হয়েই তিনি এসেছিলেন সেখানে। তিনি দর্জীকে ফাঁসির আসামী হিসেবে দেখে অন্তরে করুণা এবং বিস্ময় বোধ করলেন। তারপর দর্জীর মুখে তাবৎ কাহিনী শুনে তিনি ঘাতককে বললেন, 'ভাই! ক্ষণ-কাল অপেক্ষা কর। একে আমি চিনি। এ নির্দোষ। নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ হরণ করে পাপের ভাগী হয়ো না। আমি এখনই সুলতানের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলছি। তিনি নিশ্চয়ই সুবিচার করবেন। আমার ফিরে না আসা অবধি এর যেন কোনো ক্ষতি করো না।'

ঘাতক চিনত মহামতি কায়েসকে। তিনি দেশের একজন বিশেষ সম্মানিত মানুষ। স্বয়ং সুলতানও তাঁকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। তাই ঘাতক রাজী হলো অপেক্ষা করতে।

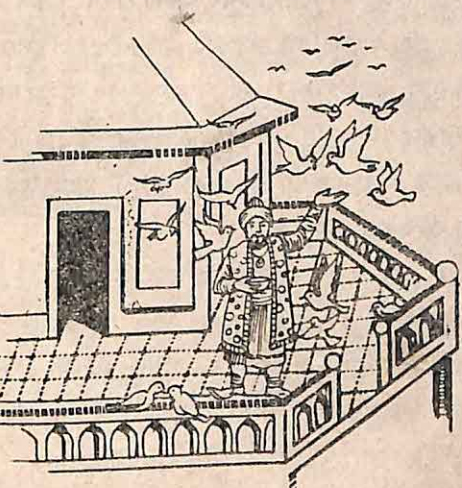
মহামতি কায়েসের মুখে প্রকৃত তথ্য শুনে সুলতান ও শাহজাদা দুজনেই যারপরনাই দুঃখিত ও লজ্জিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে মুক্তি দিলেন দর্জীকে আর দর্জীর বদলে ফাঁসি দেওয়ার হুকুম দিলেন বিশ্বাসঘাতিনী গোলেন্দামকে। দর্জীকে অনেক পুরস্কার দিলেন, এমনকি প্রাসাদের একজন সুন্দরী বাঁদীর সঙ্গে তার বিবাহও দিলেন মহা সমারোহে।

বাদশা সোলেমানের পক্ষী বৃত্তান্ত



বাদশা সোলেমান খুব পাখী ভালবাসতেন। তাঁর চিড়িয়াখানায় নানান জাতের অনেক রকম ভাল ভাল পাখী ছিল। পাখীদের নানান গুণের মধ্যে একটা গুণ এই থাকে যে, অনবরত মানুষের সংস্রবে থাকতে থাকতে তারাও মানবিক অনেক আচার-আচরণ হুবহু নকল বা আয়ত্ত করতে পারে। এমনকি কথা কইতেও শেখে মানুষের ভাষায়।

বাদশা সোলেমানের সংগ্রহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল একটি শ্বেত বর্ণের শুকপাখী। যেমন সুন্দর ছিল তার চেহারা তেমনই অসাধারণ ছিল তার ধী-শক্তি। বাদশার বড় আদরের ছিল সে।



একবার হলো কি, হঠাৎই পাখীটির মনে পূর্বজীবনের সমস্ত স্মৃতি জেগে উঠল। নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর বনের গভীরে গাছের কোটরে সুখনীড়টির কথা মনে পড়ে গেল তার। কেমন যেন বিষণ্ণতা বোধ করল সে। তাই একদিন সুযোগ পেয়ে শ্বেত-শুক উড়ে গেল হঠাৎ।

অনেকদিন পরে স্বামীকে ফিরে আসতে দেখে শারীর আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু পাখী হলেও নারীজাতি তো, আর নারীজাতির স্বভাবগুণে প্রেমের আগে অভিমানটাই এসে দখল করল তার হৃদয়। ফলে। অনেক কাটা কাটা কথাই শারী শোনাতে লাগল শ্বেত শুককে। যেমন—বাদশার মঞ্জিলে সোনার খাঁচায় থেকে, সোনার বাটিতে রাজভোগ খেয়ে, বাদশা আর বেগমের আদর-সোহাগ পেয়ে এ অধিনীকে আর মনে পড়বে কেন? আমি তোমায় প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় মনে করতাম আর তুমি নির্দয় পাষাণপ্রাণ পুরুষ এক দিনের জন্যেও আমার কথা ভ ববার অবসর পাওনি। যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না...ইত্যাদি।

শুক তখন তাকে নানান মিষ্টি কথায় বশীভূত করার প্রাণপণ চেষ্টা করল, বলল ঃ অপরাধ তার···অন্যায় তার. শারী তাকে কোপানলে ভস্মীভূত করুক শতবার। সে একটুও প্রতিবাদ করবে না। আজ থেকে সে অঙ্গীকার করছে, আর কখনো শারীকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না...ইত্যাদি। শারী ঠাণ্ডা হলো।

যথাসময়ে ডিম থেকে শারীর একটি সুন্দর শাবক ভূমিষ্ঠ হলো।

শুক-শারীর আনন্দ আর ধরে না। তার রঙের কি বাহার। মাথাটি হলুদ; কণ্ঠ নীল; বুক শাদা; ডানা সবুজ আর লেজটি লাল।

শিশুটিকে নিয়ে শুক আর শারী সুখেই বাস করতে লাগল। শুকপাখীটি উড়ে যাবার পর বাদশা সলোমনের মনে কষ্টের সীমা ছিল না। কোথায় যে গেল পাখীটা—কীভাবে যে দিন কাটছে—আর কখনো ফিরে আসবে কিনা; এই ধরনের নানান ভাবনায় দিনে রাত্রে তাঁর ঘুম হতো না। অনেক দিন আশায় আশায় থেকে শেষে আর থাকতে না পেরে, তিনি একদিন একদল লোক পাঠালেন তাঁর প্রিয় শুকপাখীকে খুঁজে আনার জন্য। এবং এর জন্য মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণাও করলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বহুদিন ধরে বহু অনুসন্ধান করেও শ্বেতশুককে কোথাও পাওয়া গেল না। বাদশা খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। মনে মনে চিন্তা করলেন—শুকপাখী যে কখন কোন গাছে আশ্রয় নেবে আগে থেকে তা আন্দাজ করে নেওয়া শক্ত। আবার আন্দাজ করলেও তাকে ধরা আরও শক্ত ব্যাপার। লোকজন দেখলে সন্দেহ করে সে আগেই পালাবে। এক্ষেত্রে কৌশলে কাজ উদ্ধার করাই যুক্তিযুক্ত।

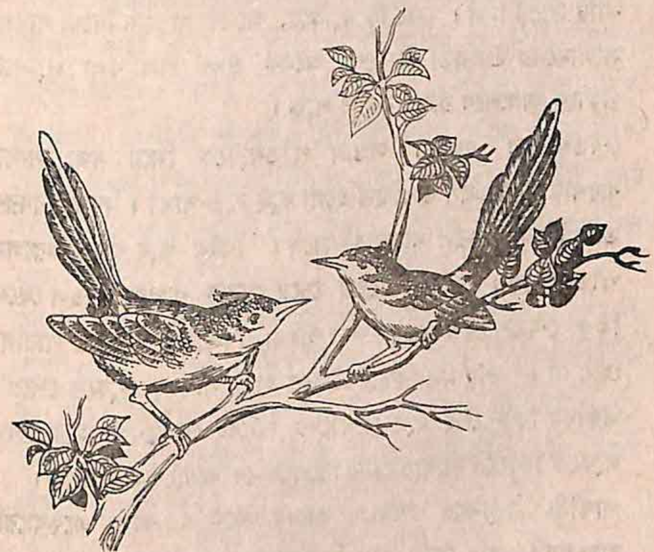
এই ভেবে বাদশা এবার চালাক-চতুর এবং দূতীয়ালিতে নিপুণ এমন দুটি পাখীকে শিখিয়ে বুঝিয়ে পাঠালেন তার খোঁজে; এই পাখীদুটিও শুক তবে শ্বেতবর্ণের নয়। এদের রং লাল।

দূত-পাখীদুটি বাদশার হারাণো শুকের সন্ধানে বনে বনান্তরে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে দিন পনের বাদে একদিন তার দেখা পেল। দেখল, সে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর সংসার করছে। অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ শেষ করে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো।

এই লাল রঙের পাখীদুটিকে চিনত বাদশার প্রিয় শুকটি। তাই বন্ধুভাবেই তাদের গ্রহণ করল।

দূত-শুকপাখীরা একথা-সেকথার পর বলল, 'ভাই! তুমি পালিয়ে চলে আসার পর বাদশা তোমার খোঁজে নানান চেষ্টা করবার পর কিছুতেই যখন তোমায় ফিরে পেলেন না তখন তিনি রেগে আগুন হয়ে বললেন—"আমার চিড়িয়াখানা থেকে দূর করে দাও সবকটা চিড়িয়াকে। ব্যাটারা আমারই খাবে আবার আমার সঙ্গেই নেমক-হারামী করবে। মরুক ওরাও দুঃখে-কষ্টে।" তারপর বাদশার হুকুমে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হলো আকাশে। এতদিন রাজভোগ খেয়ে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন অন্য খাবার মুখে রুচবে কেন? তাছাড়া দীর্ঘ দিন ধরে খাঁচায় বন্দী থেকে ডানার জোরও কমে গেছে আগের চেয়ে। ওড়বার গতি ও শক্তি, শত্রুকে ফাঁকি দেওয়ার কায়দা-কানুন সব বেমালুম ভুলে বসে আছি আমরা। ফলে আমাদের আর দুঃখ-কষ্টের অবধি ছিল না। সহ্য করতে না পেরে অনেকে তো মরেই গেল মাঝপথে। শত্রুর শিকারও হলো কেউ কেউ। বাদশা আমাদের তাড়িয়ে দেবার সময় বলেছিলেন—"যদি আমার হারাণো শুককে তোমরা ফিরিয়ে আনতে পারো তবেই ফিরে এসো এখানে। আবার আগের মত সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে। নাহলে এপথ আর মাড়িও না।"

ভাই শুক ! আমাদের বিনীত অনুরোধ, তুমি বাদশার কাছে ফিরে চলো। তোমায় পেলে তিনি আমাদের ক্ষমা করে আবার আশ্রয় দেবেন তাঁর চিড়িয়াখানায়। আমরা আবার নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারব আগের মত। আর তুমি না গেলে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমরা সকলেই একে একে ধ্বংস হয়ে যাব। তোমার একার জন্যে নিরপরাধ আমরা মৃত্যুবরণ করি, এই কি তুমি চাও?' দূত-পাখীদের কথা খুব একটা অযৌক্তিক ঠেকল না শ্বেতশুকের কানে। সে কিন্তু উভয় সংকটে পড়ে গেল। একদিকে নিজের পরম সুখী গৃহীজীবন, অপরদিকে সমুদয় পক্ষীজাতীর প্রতি তার কর্তব্য।



স্বামীকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দেখে শারী সেই আগন্তুক

পাখী দুটিকে বলল, 'ভাইদুটি! তোমরা বাদশার কাছে ফিরে গিয়ে বলো যে; আমিই তাঁর শুককে জোর করে আটকে রেখেছি; তাকে যেতে দিচ্ছি না। তাহলে তিনি আর কাউকে দোষী বলে মনে করবেন না। কারণ তিনি জ্ঞানী মানুষ। মেয়েদের স্বভাব যে কেমন তা তিনি বিলক্ষণ জানেন।'

শ্বেতশুক বাধা দিয়ে বলল, 'না না না। বাদশা আমায় খুব ভালবাসেন। ওঁর সঙ্গে এ ধরনের অভদ্রতা করা উচিত হবে না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। আমায় যেতে না দাও আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দাও বাদশার কাছে। আমার হয়ে সেই ক্ষমা চেয়ে আসুক।'

শারী তাতে নারাজ। সে মহা আপত্তি তুলল এ প্রস্তাবে। কান্না-কাটি জুড়ে দিল। অনেক বুঝিয়ে; অনেক সান্ত্বনা দিয়ে; বাদশা সলোমনের উদারতা সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা শুনিয়ে পত্নীকে অবশেষে রাজী করাল শুক।

শ্বেতশুকের একমাত্র সন্তান পীতশুককে নিয়ে যথা সময়ে বাদশার কাছে এসে উপস্থিত হলো দুই দূত-পাখী। সমস্ত বিবরণ তারা নিবেদন করল বাদশার কাছে। তিনি খুব আদর করলেন পীতশুককে। যদিও বাপের চেয়ে অনেক রূপবান ছিল ছেলে কিন্তু শ্বেতশুকের গুণের কথা বাদশা কিছুতেই ভুলতে পারছি-লেন না। তাঁর মন কিছুতেই তৃপ্ত হলো না পীতশুককে পেয়ে। একদিন তিনি সেই দূত-পাখীদের ডেকে; যেভাবেই হোক শ্বেত শুককে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

পাখীরা প্রত্যুত্তরে জানাল; তাদের পক্ষে এ কাজ একেবারেই অসম্ভব। যদি কেউ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে, সে ঐ পীত

শুক—তার পুত্র।

বাদশা বললেন, 'তবে সেই ব্যবস্থাই কর।'

বাচ্চা শুককে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখে তার মা ও বাবা খুব খুশী হলো। বাদশার কুশল জিজ্ঞাসা করল শ্বেতশুক। প্রত্যুত্তরে পীতশুক বলল, 'বাবা! বাদশা সলোমনকে যতটা মহান আপনি ভাবেন ততটা মহান তিনি নন। আমি সেখানে পৌঁছন মাত্রই তিনি আমাকে কৌশলে খাঁচায় পুরে ফেললেন, তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আপনাদের দুজনকে জীবিত অথবা মৃত ধরবার জন্য একদল চিড়িয়ামারকেও রওনা করিয়ে দিয়েছেন এই দিকে। এইসব ব্যবস্থায় বাদশা জড়িয়ে থাকায় আমার দিকে বিশেষ নজর রাখতে পারেননি। ফলে সুযোগ পেয়েই পালিয়ে এসেছি আমি। আপনি আর এক মুহূর্তও দেরী করবেন না বাবা। আসুন আমার সঙ্গে। আসার পথে আমি একটা চমৎকার জায়গা দেখে এসেছি। সেখানে লুকোলে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না।'

ছেলের কথায় শুক আর শারীর মনে ভয় ঢুকে গেল। তারা আর ইতস্ততঃ না করে পীতশুকের পিছন পিছন উড়ে চলল প্রাণের আশঙ্কায়।

ফাঁদ আগেই পাতা ছিল। সেই ফাঁদে আটকা পড়ল শ্বেত শুক আর শারী। পীতশুক এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অনুমাত্রও অনুতপ্ত হলো না। নিজের স্বার্থই তার কাছে বড় হয়ে উঠল। আর এই স্বার্থের পায়ে নিজের পিতা-মাতাকেও বলি দিতে কুণ্ঠিত হলো না সে।

যোগ্য উত্তরাধিকারী



অনেক কাল আগে মিশরের দক্ষিণে একটি রাজ্য ছিল তার নাম ইথিওপিয়া। সেখানে রাজত্ব করতেন সুলতান কামরুদ্দিন। তিনি একজন সুশাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে রাজ্যের প্রজারা বেশ সুখে শান্তিতেই ছিল। একটানা পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করার পর, বার্ধক্যের দরুণ ক্রমে রাজ্যভার তাঁর কাছে অতি গুরুভার বলে বোধ হতে লাগল। তখন তিনি উপযুক্ত পুত্রের হাতে রাজ্যের ভার তুলে দিয়ে নিজেকে ঈশ্বর-উপাসনায় নিযুক্ত রাখতে উৎসুক হলেন।

তাঁর তিন বেগম ছিল। এই তিন বেগমের ছিল তিনটি পুত্র



সন্তান। বড়—কাসেম; মেজ—কাদির, আর ছোট—কামাল। রূপে গুণে শৌর্যে বিদ্যায় তিন শাহজাদাই ছিলেন তিনটি রত্ন বিশেষ। বেগমরা যখন সুলতানে ইচ্ছার কথা শুনলেনর তখন তিনজনেই তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন তাঁর ছেলেকেই সিংহাসনে বসাবার জন্য। মহা বিপদেই পড়লেন সুলতান।

একবার ভাবলেন; প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বড় ছেলেকেই তখ্তে বসাবেন; আবার প্রিয়তমা দ্বিতীয় বেগমের অনুরোধ না রাখলে তিনিও গোঁসা করবেন—মনে কষ্ট পাবেন; তাঁর নিজের পছন্দ কিন্তু ছোট ছেলেকেই।

কী যে তাঁর কর্তব্য; সুলতান কিছুতেই তা স্থির করে উঠতে পারলেন না। যেটাই করবেন তারই ফলশ্রুতি দেখা দেবে অতি বিশ্রীভাবে। তিনি চান না এই সিংহাসন নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে অথবা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মনোমালিন্য তার বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হোক। তারচেয়ে যাদের নিয়ে এই রাজ্য তারাই তাদের রাজাকে বেছে নিক!

এই ভাবে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে মনে মনে অনেকটা শান্তি পেলেন সুলতান কামরুদ্দিন এবং পরদিনই দরবারে গিয়ে সেই সিদ্ধান্তই ঘোষণা করলেন।

সুলতানের কথায় প্রজাদের মুখপাত্রগণ আর আমীর ওমরাহরা মহা ধাঁধায় পড়ে গেলেন। তিন শাহাজাদাই তখন দরবারে উপস্থিত ছিলেন। সকলে তাঁদের তিনজনের দিকে তাকান আর নিম্নকণ্ঠে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে করতে ঘাড় নাড়েন। অর্থাৎ তিনজনের কাউকেই অপছন্দ করতে পারছেন না। কাকে ফেলে কাকে সিংহাসনে বসাবেন?

অবশেষে প্রধান উজীরই এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সুলতান সমেত সবাইকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'তিন শাহাজাদাই সমান রূপবান, বিদ্বান এবং বীর। গুণেও ওঁরা সমান সমান মনে হলেও আমার মনে হয়, খুব সূক্ষ্ম একটা তফাৎ তিনজনের মধ্যে। কিছু না কিছু আছেই—বাইরে থেকে যা বোঝা যায় না। তাই আমাদের প্রস্তাব, তিন শাহাজাদাকেই তিন দিন করে তখ্‌তে বসিয়ে রাজকার্য চালবার সুযোগ দেওয়া হোক। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন শাহাজাদা কি উপায় অবলম্বন করে রাজকার্য পরিচালনা করেন তা দেখে আমরা সবাই জানতে পারব কে সুলতান হওয়ার উপযুক্ত।'

শাহজাদারা সবাই এমন কি স্বয়ং সুলতান কামরুদ্দিনও এই সরল অথচ কার্যকরী পন্থাটির সপক্ষে রায় দিয়ে প্রধান উজীরকে সাধুবাদ জানালেন। সকলেই সন্তুষ্ট হলেন।

হলেন না শুধু তিন বেগম। তাঁরা ভাবলেন তাঁদের পুত্রদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হলো। ন্যায্য হকদারকে আটকে দেওয়া হলো চালাকি করে।

শাহজাদা কাসেম জ্যেষ্ঠ তাই তাঁর পালা সবার আগে। তাঁর মা তাঁকে উপদেশ দিলেন এই বলেঃ 'শোন পুত্র! রাজকার্য পরিচালনা করা অতি কঠিন ব্যাপার, তুমি ছেলেমানুষ এবং অনভিজ্ঞ। আমি দীর্ঘকাল ধরে দেখে আসছি তোমার পিতার রাজ্য শাসনের ধারা। তাই আমার উপদেশ শোন—নিজেকে দয়ার অবতার করে তুলবে...দীন-দরিদ্র দুঃখী মানুষকে অকাতরে দান করবে... রাজ্যের চির প্রচলিত নিয়ম-কানুনকে চট করে বদলাতে যাবে না...মহতের সম্ভ্রম রক্ষা করা আর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার

করাই যেন তোমার প্রধান লক্ষ্য হয়…প্রজাদের অযথা পীড়ন করবে না। আমাদের এই কটি উপদেশ মেনে চললেই দেখবে সুলতান তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকেই তখ্‌তে বসাবেন।'

মায়ের উপদেশ মতই তিনদিন ধরে রাজকার্য পরিচালনা করে গেলেন শাহাজাদা কাসেম। সুফলও কিছু পেলেন। অনেকেই সন্তুষ্ট হলেন তাঁর কাজ দেখে কিন্তু সবাই হলেন না। কারণ রাজকার্য পরিচালনা করতে গেলে অন্যান্য গুণের সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিশেষ প্রয়োজন। সেই বিশেষ গুণটিই ছিল না শাহাজাদা কাসেমের।

তিন দিন পরে বসলেন মধ্যম কুমার শাহাজাদা কাদির। তাঁর মা তাঁকে উপদেশ দিলেন ঃ 'বৎস! রাজত্ব কায়েম রাখতে গেলে আগে রাজ্যের ধনী প্রভাবশালী ও প্রতিপত্তিশালী মানুষদের নিজের তরফে আনতে হবে। তাহলেই তাঁরা তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তুমিই যাতে বরাবর তখতে বসবার অধিকার পাও সেই চেষ্টাই করবেন। সাহায্য করবেন। তারপর তাঁদের সাহায্যে তোমার কাজ হাসিল হয়ে গেলে তাঁদের হটিয়ে দিয়ে আবার পুরোনো ধারা ফিরিয়ে আনতে কতক্ষণ? এরই নাম রাজনীতি। বুঝেছ? শাহজাদা মায়ের উপদেশ মতই কাজ করলেন। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীতই হলো। সুলতান স্বয়ংই বিরূপ আর রুষ্ট হলেন পুত্রের ওপর।

এবার শাহজাদা কামালের পালা। তিনিও তাঁর মায়ের কাছে অনেক মূল্যবান উপদেশ পেলেন বটে তবে কানে তুললেন না। সিংহাসনে বসে সব আগে ঘোষণা করলেন: 'দরবারস্থ প্রিয় ও পূজনীয় সজ্জনগণ! আমি এ রাজ্যের চির প্রচলিত বিধি ভঙ্গ করে কোন কাজ করব না অথবা করতেও চাই না। তবে কখনো কোনও ব্যাপারে আমার সন্দেহ বা সমস্যা উপস্থিত হলে আমি আপনাদের মতামত চাইব। আশা করি আপনারা আমাকে অকুণ্ঠভাবে সেই সাহায্য করবেন। তাতে আমার নিজের অভিজ্ঞতা বাড়বে। আমি যা জানিনা তা শিখতে পারব।'

শাহজাদা কামালের কথায় দরবারীরা সকলেই এবং সুলতান নিজেও খুব প্রীত হলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীকে চিনে নিতে তাঁর ভুল হয়নি। এখন শেষ রক্ষা হলেই মঙ্গল।

প্রথম দিন ভালমতই কাটল। দ্বিতীয় দিনে শাহাজাদা কামালের রাজনীতি জ্ঞান যাচাই করার উদ্দেশ্যে সুলতান কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কাছে।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'শাহজাদা! আমার একটি ছোট প্রশ্ন আছে। দয়া করে উত্তর দিলে অনুগৃহীত হব।'

—'বলুন আপনার প্রশ্ন।'

—আমার প্রশ্ন: কোন কোন ব্যক্তিকে সদা-সর্বদা কাছে রাখা একজন সুলতানের আদর্শ কর্তব্য?'

শাহজাদা তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হেসে বললেন, 'জনাব, সুচারু ভাবে রাজকার্য সম্পন্ন করতে গেলে কমপক্ষে আটজন মানুষের। সাহায্য একজন সুলতানকে নিতেই হবে। আর সেই আটজন

হলো—১। উজীর ২। সিপাহশালার ৩। কোতায়াল ৪। নকল নবিশ ৫। হেকিম ৬। মৌলভী ৭। কাজী ৮। ভাঁড়।'

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন 'শাহজাদা! আমার প্রশ্ন ঃ একজন রাজা, তাঁর প্রজা তাঁর রাজ্য, তাঁর সেনাপতি ও তাঁর শত্রুকে কার কার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে?'

শাহাজাদা কামাল কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে উত্তর দিলেন ঃ 'জনাব আমার মতে রাজাকে মেষপালক, প্রজাকে মেষ, রাজ্যকে প্রান্তর, সেনাপতিকে কুকুর আর শত্রুকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শাহজাদার উত্তর শুনে সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল। আনন্দে সুলতানের বুক ভরে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, 'আমার ছোট ছেলেই যথার্থ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং সিংহাসনে বসার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু প্রজাদের মতামত না নিয়ে তাকে সুলতান করতে পারি না। আগামী পর্শুই এ বিষয়ে ফয়সলা করতে হবে তার আগে আগামীকাল যোগ্যতা যাচাইয়ের শেষদিনে আমি একবার নিজে পরীক্ষা করব শাহজাদাকে।'

সেই উদ্দেশ্যে রাজকার্য পরিচালনার তৃতীয় ও শেষ দিনে সুলতান স্বয়ং শাহজাদার বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনজন বিচারাধীন কয়েদীকে তাঁর সামনে এনে হাজির করলেন। এবং শাহজাদাকে তাদের স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সব কথা মন দিয়ে শুনে, বিচার করে যথাযোগ্য শাস্তি দেবার অনুমতি দিলেন। এই তিন

কয়েদীর মধ্যে একজন চোর; একজন গ্‌ন্ডা এবং অপরজন বদমাইস ছিল।

পিতার আদেশ অন্‌সারে শাহজাদা কামাল প্রথমেই চোরের বিচার আরম্ভ করলেন। তার ও তার বির্‌দ্ধ পক্ষের বক্তব্য শোনার পর শাহজাদা রায় দিলেন—'অপরাধের তারতম্য অন্‌সারে শাস্তিরও তারতম্য হয়ে থাকে। কোন কোন কাজে 'অপরাধ গ্‌র্‌তর হয়ে থাকে এবং কোন কোন কাজে অপরাধ কিছ্‌ পরিমাণ লঘ্‌ হয়ে থাকে। এই চোরটি যদিও একটি মোহর ভরা বাক্স চুরি করেছে



তব্‌ আমাদের রাজ্যের প্রচলিত নিয়ম অন্‌যায়ী একে হস্ত চ্ছেদের দন্ড দেওয়া যায় না। তার প্রথম কারণ লোকটি স্বভাব অপরাধী নয়; অভাব অপরাধী। দ্বিতীয়ত, যে বাক্সটি চুরি করেছিল তার ওপরে সুলতানের রাজকীয় পাঞ্জা মোহর ছিল না। অর্থাৎ ওটি দৌলতখানার অর্থ নয়। ছিল গরীবদের

খুন-পিয়াসী একজন সাহুকারের। সুতরাং চোরকে আমি কেবল এক বৎসরের সশ্রম কারাবাসের দণ্ড দিয়ে তার চরিত্র সংশোধনের সুযোগ দিলাম।'

এর পর গুণ্ডার বিচার। শাহজাদা রায় দিলেন ঃ 'এই লোকটি নিজের ভাইকে হত্যা করার জন্যই অস্ত্র উত্তোলন করেছিল বটে কিন্তু পরক্ষণেই মনে অনুতাপ জাগায় সুযোগ সত্ত্বেও মারাত্মক আঘাত না হেনে শুধুমাত্র দেহে কয়েকটি আঁচড় কেটেই রেহাই দিয়েছে তাকে। মনে মনে পরিকল্পনা করা আর বাস্তবে তা পরিণত করা—এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। অতএব লোকটিকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে কেবল তিন বৎসরের সশ্রম কারা দণ্ডের আদেশ দিচ্ছি।'

অবশেষে বদমাইসের বিচার আরম্ভ হলো। শাহজাদা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তার অপরাধের সাক্ষীদের ডাকলে কয়েকজন লোক এগিয়ে এলো সাক্ষ্য দিয়ে তার অপরাধ সপ্রমাণ করতে।

শাহজাদা বললেন, 'এ ধরনের অপরাধ সপ্রমাণ করতে কমপক্ষে চারজন সাক্ষীর দরকার। তারা যে দৈবাৎ এই অপরাধ দেখে ফেলেছে সে কথা সপ্রমাণ করতে না পারলে তাদের সাক্ষ্যের কোনও মূল্য নেই। সেক্ষেত্রে আমার ধরে নিতে হবে যে অপরাধীকে বাধা না দিয়ে তারা নিজেরাই আড়ালে থেকে ব্যাপারটা উপভোগ করে এখন সাধু সেজেছে অতএব তারাও সমান শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।'

শাহজাদার কথায় চারজন সাক্ষীই চুপ। তারপর তারা করজোড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল বার বার। শাহজাদা সকলকেই ক্ষমা করলেন বটে তবে একেবারে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দিলেন না। প্রত্যেককে

পঞ্চাশ দীনার করে জরিমানা করলেন।

বৃদ্ধ সুলতান কামরুদ্দিন নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে পুত্রকে আলিঙ্গন করে সহর্ষে বললেন, 'আর আমার চিন্তা নেই। আমি আমার তখ্‌তের যোগ্য উত্তরাধিকারীকেই পেয়েছি। বৎস। তুমিই এ রাজ্যের সুলতান হলে।' সভাসদেরা অতঃপর মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করে উঠল শাহজাদা কামালের নামে।

সুলতানের তিনটি উপদেশ

সুলতান তরলবেগ ছিলেন তূরাণের অধীশ্বর। খুব দাপটের সঙ্গে দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর তিনি সহসা একদিন ঘোর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর আপনার অন্তিমকাল আসন্ন বুঝে তিনি তাঁর তিন পুত্রকে কাছে ডেকে বললেন, 'পুত্রগণ! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। আর বেশীক্ষণ জীবিত থাকব না আমি। তোমরা এখনও বালক; পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং আমি তোমাদের দু-একটি উপদেশ দিচ্ছি শোন। তোমরা আমার উপদেশ মত কাজ করলে নিশ্চয়ই সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারবে।'

এই বলে তিনি প্রথম পুত্রকে ডেকে বললেন, 'পুত্র! আমার রাজ্যে যত বড় বড় শহর আছে, তার প্রত্যেকটিতে তুমি একটি করে সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করাবে।'

দ্বিতীয় পুত্রকে ডেকে বললেন, 'পুত্র! তুমি প্রতিদিন এক একটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করবে।'

তৃতীয় পুত্রকে ডেকে বললেন, 'পুত্র! আহারের আগে তুমি প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যে ননী আর মধু মিশিয়ে খাবে।'

তিন পুত্রকে এই তিনটি চমৎকার উপদেশ দিয়ে বাদশা তরলবেগ চিরদিনের মত চোখ বুজলেন।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম শেষ করে তিন পুত্র এবার পিতৃ-প্রদত্ত সেই উপদেশ বাস্তবে রূপ দিতে শুরু করলেন। প্রথম পুত্র প্রত্যেক শহরে এক একটি অট্টালিকা তৈরী করাতে লাগলেন; দ্বিতীয় পুত্র প্রতিদিন এক একটি মেয়েকে বিবাহ করে চললেন; আর তৃতীয় পুত্র সব খাবারেই ননী ও মধু মাখিয়ে খেতে লাগলেন।

একদিন এক প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তিন বাদশাজাদাকে এই ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করতে দেখে তাঁদের বললেন, 'এ আপনারা কী করছেন? মৃত্যুকালে আপনাদের পিতা আপনাদের যখন উপদেশ দান করেন, সে সময়ে আমিও উপস্থিত ছিলাম তাঁর শেষ দর্শনাভিলাষী আগন্তুক দলে। তাঁর মহৎ উপদেশ আমি শুনেছি। তিনি আপনাদের যা বলেছেন; দুঃখের বিষয় আপনারা তার মর্ম

আদৌ বুঝতে পারেননি। আমি আপনাদের তাঁর উপদেশের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারি যদি শুনতে ইচ্ছা করেন।'

প্রকৃতপক্ষে তিন বাদশা পুত্রেরও পিতার এই তিন উপদেশ একটু অদ্ভুত মনে হয়েছিল। কিন্তু মনে হলেও পিতৃ আদেশ তাঁরা লংঘন করতে সাহসী হননি। তাই সহজেই তাঁরা সম্মত হলেন পিতৃ উপদেশের প্রকৃত ব্যাখ্যা শুনতে।

প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিটি বললেন, 'উত্তম। তার আগে একটা গল্প শুনুন আপনারা। গল্পটা এইজন্যে শোনাচ্ছি, এর সঙ্গে আপনাদের পিতৃদত্ত উপদেশের অনেক মিল আছে। তাই এ গল্পটি শোনা আপনাদের একান্ত কর্তব্য।'

এই বলে সেই ব্যক্তি গল্প আরম্ভ করলেন—

'অনেক দিন আগে বসোরায় ইয়াকুব শেখ নামে এক সুলতান রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্যে কয়েক হাজার খৃষ্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তি বাস করত। সুলতানকে তারা কিন্তু কোনওরকম কর দিত না। চাইলেও নানা ওজর-আপত্তি তুলত। টাল-বাহানা করত। সুলতান ধৈর্য ধরে তাদের কার্যকলাপ সহ্য করলেন। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে একদল সশস্ত্র সৈন্য পাঠিয়ে দলের নেতাকে বলে দিলেন, যেভাবে হোক খৃষ্টানদের কর আদায় করে আনতে।

এর ফলে খৃষ্টানেরা খুবই ভয় পেয়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে এক সভা ডেকে আলাপ আলোচনায় বসল। সর্ববাদীসম্মতরূপে

একটি প্রস্তাব গৃহীত হলো সেই সভায় ঃ পাদ্রী জন তাদের মুখপাত্র হয়ে আপাততঃ কর নিয়ে যাবেন সুলতানের দরবারে। সেখানে গিয়ে একটি প্রশ্ন করবেন সুলতানকে। সুলতান স্বয়ং অথবা তাঁর সভাসদদের কেউ সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে তবেই খৃষ্টানেরা কর দেবে সুলতানকে। আর উত্তর দিতে না পারলে সুলতান করের হাত থেকে রেহাই দেবেন তাদের—এই শর্ত।

প্রস্তাব অনুযায়ীই কাজ হলো।

সুলতান ইয়াকুব শেখ খুবই রসিক এবং গুণগ্রাহী মানুষ ছিলেন। তিনি সম্মত হলেন পাদ্রী জনের শর্তে।

পাদ্রী জন তখন বললেন, 'সুলতান! আমার প্রশ্ন কিন্তু মুখের বাক্যে হবে না। হবে ইঙ্গিতে। তার উত্তরও দিতে হবে ইঙ্গিতে।' এই বলে তিনি তাঁর ডান হাত ঈষৎ উত্তোলন করে পাঁচটি আঙুল সমেত করতলটি দেখালেন সুলতানকে। তারপর আঙুলগুলি মাটির দিকে নীচু করে বললেন, 'সুলতান ও সভাসদগণ! এই আমার প্রশ্ন। যদি আপনারা এর যথার্থ মর্ম বুঝে থাকেন তবে উত্তর দিন।'

অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও যখন পাদ্রী জনের প্রশ্নের তাৎপর্য ধরতে পারলেন না তখন সুলতান তাঁর সভাসদদের আদেশ করলেন ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে। কিন্তু সভাসদেরা প্রায় সকলেই একে একে নিজের অক্ষমতা জানালেন ঐ গূঢ় প্রশ্নের উত্তর দিতে। সেই সময় জনৈক ওমরাহ উঠে বললেন যে, প্রশ্নটি আর একবার করা হোক, তিনি এর উত্তর দেবেন।

সম্মত হয়ে পাদ্রী জন যখন ওমরাহকে তাঁর প্রসারিত করতল দেখালেন প্রত্যুত্তরে ওমরাহ তখন পাদ্রীকে নিজের বদ্ধমুষ্টি

পাদ্রী জন যখন হাতের আঙ্গুলগুলো মাটির দিক নীচু করলেন ওমরাহ তার জবাবে নিজের আঙ্গুল ওপর দিকে উঁচিয়ে ধরলেন। ওমরাহের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন পাদ্রী জন। তিনি তখন তাঁর টাকার থলিটি সুলতানের পদতলে রেখে; তাঁকে অভিবাদন করে; সঠিক উত্তরদাতা ওমরাহটিকে অভিনন্দন জানিয়ে দরবার থেকে বিদায় নিলেন।

পাদ্রী জন দরবার ত্যাগ করবার পর সুলতান সেই বিজ্ঞ ওমরাহটিকে কাছে ডেকে তাঁকে পাদ্রীর প্রশ্ন ও তাঁর উত্তরের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করলে ওমরাহ সগর্বে বললেন, 'হজরৎ। পাদ্রী তার করতল দেখিয়ে আমাকে চাপড় মারার অভিপ্রায় জানালে, আমি তাকে বদ্ধমুষ্টি দেখিয়ে পরিবর্তে ঘুষি মারার ইচ্ছা প্রকাশ করি।



'তারপর পাদ্রী তাঁর হাতের আঙুলগুলি নীচু করে জানান যে, আমি তাকে ঘুষি মারলে সে আমাকে মাটিতে ফেলে পায়ের তলায়

পিষে আমার হাড়-পাঁজরা গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে। জবাবে আমি আমার হাতের আঙুলগুলি আকাশের দিকে উঁচিয়ে জানালাম যে, তা করলে সেও রেহাই পাবে না। আমি তাকে মেরে তুলোধোনা করে তার খণ্ডবিখণ্ড দেহ আকাশে ছুঁড়ে দেব আর চিল-শকুনি-বাজ ইত্যাদি মাংসাশী পাখীরা সেই দেহাংশগুলি আরামে খাবে। পাদ্রী বেগতিক দেখে তাই পালাল।'

স্থলতান তাঁর ওমরাহের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চাতুর্যের পরিচয় খুবই সন্তোষ লাভ করলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে পঞ্চাশটি মোহর দান করলেন। ওমরাহের বুক ফুলে গেল শ্লাঘায়।

রাত্রে প্রধানা বেগমের মহলে আহারাদি সারতে সারতে স্থলতান এই আশ্চর্য ঘটনাটি খুলে বললেন তাঁকে। বেগম শুনে ঈষৎ হেসে বললেন, 'হজরৎ! আপনার ঐ ওমরাহটি খুবই চতুর



সন্দেহ নেই। নাহলে শুধু সেই পাদ্রীকেই নয়, স্বয়ং আপনাকেও সে প্রতারিত করছে কৌশলে। আমার কথা সত্য কিনা যথাসময়ে

জানা যাবে। আপনি আগামী কালই পাদ্রীকে ডেকে পাঠান দরবারে।'

পরদিন সুলতানের ডাক পেয়ে পাদ্রী জন এলেন দরবারে। প্রধানা বেগমও সেখানে উপস্থিত ছিলেন পর্দার আড়ালে। তিনিই বললেন পাদ্রীকে : 'পাদ্রীসাহেব! আপনি ইতিপূর্বে সংকেত করে যে প্রশ্নটি করেছিলেন এবং ওমরাহসাহেব সংকেতে তার যে উত্তর দিয়েছিলেন, আমরা তার কোন মর্মই বুঝতে পারিনি। আপনি যদি আমাদের ঔৎসুক্য মেটান তবে বড়ই বাধিত হই।'

পাদ্রী জন জবাবে জানালেন—'বেগমসাহেবা! আমি আমার হাতের পাঁচটি আঙুল ছড়িয়ে করতল দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম—পয়গম্বর মহম্মদ যে পাঁচটি স্তোত্রের বিষয় লিখেছেন কোরাণে সেগুলি প্রকৃতই ঈশ্বর প্রদত্ত কিনা? তার উত্তরে ওমরাহসাহেব মুষ্টিবদ্ধ করে জানালেন যে, হ্যাঁ সেগুলি ঈশ্বর-প্রদত্ত।

তারপর আমি আমার আঙুলগুলি মাটির দিকে করে জানতে চাইলাম—আকাশ থেকে মাটিতে কেন বৃষ্টি নেমে আসে? ওমরাহসাহেব তাঁর আঙুলগুলি ঊর্ধ্বদিকে উঁচু করে উত্তর দিলেন যে, শস্যাদি সতেজে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠবার জন্যই পৃথিবীতে বৃষ্টি নেমে আসে। বেগমসাহেবা! আপনাদের এই ওমরাহ-সাহেব যে একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আচ্ছা, আমি তবে চলি।' পাদ্রী জন এই বলে সুলতান ও তাঁর বেগমকে অভিনন্দন করে দরবার ত্যাগ করলেন।

বেগমসাহেবার কথার যথার্থতা উপলব্ধি করে সুলতান প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি আর কখনও আমীর ওমরাহদের কথায় বিশ্বাস করবেন না।

গল্প শেষ করে সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিটি বাদশাজাদাদের সম্বোধন করে বললেন, 'বুঝলেন তো, ঐ ওমরাহের মত আপনারাও আপনাদের পিতার উপদেশের মর্ম বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে পারেননি। এবার আমি বুঝিয়ে বলছি মন দিয়ে শুনুন—

'কথায় বলে মানুষের দশ দশা, কখনো হাতী কখনো মশা। আজ যিনি অর্থ ও সামর্থের চূড়ায় বসে নিজের জীবনকে উপভোগ করছেন, নানান দিক দিয়ে। তাঁকেই হয়তো একদিন জীবন ধারণের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে হতে পারে। বাদশা সেই ভেবেই বড় কুমার, আপনাকে তাঁর রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে বাড়ী তৈরী করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এর যথার্থ তাৎপর্য এই যে, প্রতিটি শহরের ঐশ্বর্যবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় এবং সৌহার্দ্য গড়ে উঠুক এবং কখনও যদি কোনও বিপদে পড়েন তবে এই পরিচয় ও প্রীতির জোরেই সময়কালে তাঁদের সাহায্য পাবেন।

'মেজ কুমার! আপনাকে আপনার পিতার প্রতিদিন একটি করে কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়ার অর্থ—আক্ষরিক অর্থে বিবাহের নির্দেশ দেওয়া নয়; তিনি আপনাকে প্রতিদিন এক একটি শুভকাজ সম্পন্ন করতে বলে গেছিলেন। আপনি অল্পবয়স্ক তাই জানেন না, প্রাচীন ইরাণী কবিরা তাঁদের কবিতায় শুভকাজকে কুমারী কন্যার সঙ্গে তুলনা করে গেছেন। আপনি যদি প্রতিদিন এক একটি শুভকাজ করেন—যা সত্যসত্যই রাজ্যের ও সমাজের কল্যাণকর তবে বিপদের সময় আপনার আত্মীয় স্বজনেরা যত না আপনার উপকারে আসবেন—রাজ্যের তাবৎ

প্রজাবৃন্দ আসবে তার চেয়ে অনেক বেশী।

'আর ছোট কুমার! পরলোকগত বাদশা আপনাকে সত্যি সত্যি প্রতিটি খাদ্যের সঙ্গে ননী আর মধু মিশিয়ে খেতে উপদেশ দেননি। তাঁর উপদেশের তাৎপর্য ছিল আপনাকে সদালাপী ও মিষ্টভাষী করার। কারণ যে ব্যক্তি যত সদালাপী ও মিষ্টভাষী তার বন্ধুসংখ্যা তত বেশী। এই হলো আপনাদের দেওয়া বাদশা তরলবেগের উপদেশাবলীর প্রকৃত অর্থ।'

বলা বাহুল্য তিন বাদশাজাদা প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিটির পরামর্শমত কাজ করে আজীবন সুখে ও শান্তিতেই ছিলেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে অর্থ-শক্তি বা প্রতিপত্তি নিয়ে কখনও কোন গণ্ডগোল বাধেনি।

মালিক নাজির এবং
রূপসী আয়েশার কাহিনী

বাদশা কোয়ায়ুম ছিলেন মিশরের সুবিখ্যাত সুশাসকদের মধ্যে একজন। তাঁর দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম মালিক আশরাফ কনিষ্ঠের নাম মালিক নাজীর।

বাদশা একদিন তাঁর বিশ্রামকক্ষে বসে পুত্রদের কথা চিন্তা করছিলেন। মানুষের অবস্থা কখনও সমান যায় না। আজ তিনি মিশরের সিংহাসনে বসে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করে চলেছেন, কে বলতে পারে; তাঁর পুত্রদের ভাগ্যে এই রাজভোগ চিরকাল জুটবে কি না? শত্রুর আক্রমণে হয়তো তারা রাজ্যহারা হয়ে সাধারণ মানুষের মত অথবা তার চেয়েও নিম্নস্তরের অবস্থায় পৌঁছে কষ্টেসৃষ্টে দিন গুজরাণ করতে বাধ্য হবে। কোনও বিশেষ শিক্ষায় তারা শিক্ষিত নয় যে, সেই শিক্ষার পুঁজিকে সম্বল করে ভদ্রভাবে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করবে। আবার শরীরে

নীল রক্তের আভিজাত্যটুকু থাকায় তাদের পক্ষে ভিক্ষা করাও কঠিন। দস্যু-তস্কর হওয়ার মতও তাদের মনের গঠন নয়। সুতরাং নিরন্ন উপবাসে তিলে তিলে মৃত্যু ছাড়া তাদের ভবিতব্য আর কিছু নয়।

ভাবতে ভাবতে বাদশার চোখজোড়া বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তিনি স্থির করলেন, পুত্রদের কোনও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে



তুলবেন। যাতে ভবিষ্যতে কখনও কোন কষ্ট পেতে না হয় তাদের।

জ্যেষ্ঠ পুত্র কিঞ্চিৎ বয়স্ক তার পক্ষে উপস্থিত শ্রমসাপেক্ষ কাজ করা সম্ভবপর হবে না। জোর করে করাতে গেলে দেহে-মনে অসুস্থ হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে কনিষ্ঠ পুত্র এখনও তরুণ। দেহেমনে এখনও তাজা ও টগবগে। এখন থেকে চেষ্টা

করলে সে অবশ্যই শ্রমসহিষ্ণু কোন কাজে পোক্ত হয়ে উঠবে। এই সিদ্ধান্তে অটল থেকে বাদশা কোয়ায়ুম কনিষ্ঠ পুত্র মালিক নাজীরকে শ্রমসাধ্য অথচ তেমন অসম্মানকর নয় এমনই একটি কাজ—ওস্তাগরী শেখবার জন্য কায়রো নগরীর বিখ্যাত দর্জী বাবা মুস্তাফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন যথাযথ নির্দেশ দিয়ে।

বাদশার কাণ্ড দেখে আত্মীয়-স্বজনেরা তো বটেই অনেক দরবারী আমীর ওমরাহ পর্যন্ত তাঁর বিরূপ সমালোচনা না করে পারেননি।

বাদশা কিন্তু কারোর সমালোচনা গায়ে মাখলেন না। নিজের কাজের জন্য এতটুকুও অনুতপ্ত হলেন না।

অবশেষে একদিন তিনি ইহলীলা সংবরণ করলেন।

সিংহাসনে আসীন হলেন মালিক আশরাফ।

মানুষের মন কতই না বিচিত্র। সিংহাসনে বসার আগে পর্যন্ত কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের স্নেহ-ভালবাসার অন্ত ছিল না। ছোট ভাইকে দর্জীর কাছে পাঠানো হলে পিতার ওপর সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এই আশরাফই। তিনি আজ সিংহাসন পেতেই তাঁর মন ও মত দুই-ই সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ছোট ভাই নাজীরকে তিনি তাঁর চক্ষুশূল এবং নিরঙ্কুশভাবে রাজ্যপাট ভোগ করার পথে এক সাংঘাতিক কাঁটা বলে মনে করলেন। তাই তাঁর প্রথম আর প্রধান কাজই হলো এই পথের কাঁটাকে সমূলে উপড়ে ফেলা। আর সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর জনকয়েক অনুগত অনুচরকে সেই দর্জীর কাছে পাঠালেন কৌশলে নাজীরকে বন্দী করে আনতে।

কিন্তু নাজীর ছিলেন ঢের বেশী চালাক আর বুদ্ধিমান। দাদার

মতলব তিনি আগেভাগেই আন্দাজ করেছিলেন। ফলে একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে ছদ্মবেশে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেলেন কায়রো থেকে। পথে একদল তীর্থযাত্রীর দলে ভিড়ে গিয়ে সোজা চলে গেলেন মক্কাশরীফে।

মক্কায় এসে তিনি দল থেকে ছিটকে পড়ে একা একা এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এমন সময়ে হঠাৎ পথের একপাশে একটি মুখবন্ধ থলির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। লোক চলাচলের পথের থেকে একটু দূরে পড়ে থাকায় স্বভাবতই অন্য কোনও পথচারীরও দৃষ্টি সেদিকে পড়েনি।

কৌতূহলী নাজীর এগিয়ে গিয়ে থলিটা হাতে নিয়ে অনুভব করলেন; ভিতরে যেন কিছু কঠিন পদার্থ আছে। পাছে আর কারো নজরে পড়ে যায় এবং তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এই ভয়ে নাজীর থলিটা নিজের পোষাকের অন্তরালে লুকিয়ে ফেলে আবার পথ হাঁটতে শুরু করলেন। ইচ্ছে রইলো কোনও নিভৃত স্থানে গিয়ে থলিটা খুলে দেখবেন তাতে কী আছে।

কিছুটা পথ এসেছেন এমন সময়ে জনৈক ব্যক্তির কাতর বিলাপধ্বনি তাঁর কানে এসে বাজল। ভীড়ের মধ্যে কে যেন করুণ সুরে হায় হায় করছে।

কে—কেন কাঁদছে তা জানবার জন্য নাজীর ভীড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখেন; এক বৃদ্ধ কপাল চাপড়ে কান্নাকাটি করছেন। তাঁর বিলাপের কারণ তিনি তাঁর রাহাখরচের জন্য আনীত অর্থ—যা

একটি থলির মধ্যে রেখেছিলেন—পথে হারিয়ে ফেলে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তিনি তাই বার বার জনতাকে অনুরোধ করে বলছেন; যদি কোন সদাশয় ব্যক্তি ঐ থলিটি কুড়িয়ে পেয়ে থাকেন, তাঁকে ফিরৎ দিলে তিনি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। উপরন্তু তাঁর সদাশয়তার জন্য ঐ ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত পুরস্কারও দেবেন।

নাজীর বুঝলেন, তিনি যে থলিটি কুড়িয়ে পেয়েছেন সেটি এই বৃদ্ধের। থলিটির মধ্যে হয়তো বৃদ্ধের আজীবনের সঞ্চয় আছে। ভীষণ দয়া হলো তাঁর মনে। তিনি বাদশাজাদা—আভিজাত্যপূর্ণ নীল রক্তের অধিকারী—তাঁর মানসিকতা কখনোই সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মত হতে পারে না। ষড়রিপুর সব কটিকে কিছু কিছু বশীভূত করার শক্তি আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন। একজন অসহায় বৃদ্ধের আজীবনের পুঁজি অপহরণ করার মত নীচ প্রবৃত্তি তাঁর নেই। তাই তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে পোষাকের ভিতর থেকে থলিটি বার করে বৃদ্ধের চোখের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন; 'জনাব। এটি কি আপনার ?'

নিজের থলিটিকে দেখে বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। বললেন—হ্যাঁ; থলিটি তাঁরই। প্রমাণ স্বরূপ থলিটির বিশেষ ক'টি বৈশিষ্ট্যও দেখালেন সকলের সামনে।

নাজীর সানন্দে তাঁকে থলিটি প্রত্যর্পণ করলেন।

বৃদ্ধ বললেন, 'বৎস। আমি অকৃতজ্ঞ নই। এবার আমায় আমার জবানের দাম রাখতে দাও। তুমি এসো আমার সঙ্গে আমার তাঁবুতে। তোমার প্রাপ্য আমি সেখানেই মিটিয়ে দেব।'

নিজের তাঁবুতে এসে বৃদ্ধ প্রথমেই উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় দিয়ে নাজীরকে যথেষ্ট সমাদর করলেন। তারপর তাঁর সামনে টেবিলে

সেই হারানো থলিটি সম্পূর্ণ উপুড় করে দিলেন।
চমকে উঠলেন নাজীর। থলিটি স্বর্ণমুদ্রায় ঠাসা।
বৃদ্ধ সমস্ত অর্থ দুই ভাগ করে একভাগ নাজীরকে দিলেন। কিন্তু নাজীর কিছুতেই সেই অর্থ নিতে সম্মত হলেন না। বললেন, 'একজন সৎ মানুষের যা করা উচিত আমি তাই করেছি। পুরস্কারের লোভে একাজ করিনি। আমার অর্থে আসক্তি থাকলে সম্পূর্ণ থলিটাই নিতাম ফিরৎ আর দিতাম না।'
বৃদ্ধ খুবই অভিভূত হয়ে পড়লেন এই কথায়। বললেন, 'আমি এখন মসজিদে যাব উপাসনা করতে। বিশেষ করে তোমার মত সৎ ও নির্লোভ যুবকের জন্য আল্লার কাছে মঙ্গল কামনা



করতে। তুমি যদি বিশ্রাম নিতে চাও অনায়াসেই এখানে বিশ্রাম নিতে পার। তোমার যাতে সেবা-যত্নের ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে তীক্ষ্ম নজর রাখতে বলে যাব আমার বান্দা-বাঁদীদের।'
নাজীর এতক্ষণ কী যেন চিন্তা করছিলেন। বৃদ্ধের কথার উত্তরে বললেন, 'জনাব! আমার কিছু নিবেদন আছে। দয়া করে যদি

শোনেন—'

—'কুণ্ঠা কিসের? নির্ভয়ে বল, বৎস।'

নাজীর চিন্তা করে দেখলেন, তাঁর পক্ষে কায়রো ফেরা আর নিরাপদ নয়। সন্ধান পেলেই বড় ভাই তাঁর গর্দান নেবেন। সুতরাং কায়রো ছেড়ে যতদূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। এই ভেবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'জনাব! আপনার নাম জানতে পারি কি? নিবাস কোথায়?'

—'আমার নাম শেখ আবদুল্লা। থাকি বোগদাদ নগরীতে। কেন বলো তো?' কৌতূহলী হলেন বৃদ্ধ।

—'আমার নাম (একটু থেমে) নাসির। থাকি কায়রোয়। আমার দেশভ্রমণের খুব শখ। বিশেষ করে বোগদাদ নগরী দেখার সাধ বহু দিনের। জনাব যদি আমায় অনুগ্রহ করে সঙ্গে নেন—'

—'বিলক্ষণ! তোমার মত সৎ ও নির্লোভ যুবককে আমার যাত্রাসঙ্গী হিসেবে পেলে আমি বিশেষ খুশী হব। বেশ, তুমি এখানেই থাক। আর দিন কয়েক পরেই এখানকার তীর্থদর্শন সেরে আমি দেশে ফিরব।'

নাজীর সম্মত হলেন।

প্রাচ্যের বিখ্যাত নগরী বোগদাদ।

ইতিহাস এবং কিম্বদন্তীর বিশ্ববিশ্রুত নায়ক খলিফা হারুণ অল রশিদের প্রিয় রাজধানী বোগদাদ। দেখে দেখে আর আশ মেটেনা নাজীরের। কায়রোর মত সুন্দর নয়, কায়রোর মত গোছালো

নয় তবু নিজের রূপেই নিজে রূপবতী বোগদাদ। এর ইতিহাস, ঐতিহ্য আর আভিজাত্যই আলাদা।

নাজীর একদিন বৃদ্ধকে বললেন, 'জনাব! আমি সবল ও কর্মঠ যুবক হয়ে আপনার প্রতিপালিত অন্নদাস রূপে থাকতে অসম্মান বোধ করি। আমি দর্জীর কাজ জানি। আমায় যদি কোন দর্জীর দোকানে কাজে বহাল করে দেন তো খুশী হই।'

বৃদ্ধ আবদুল্লা নাজীরের কথায় মনে মনে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একটি চেনাজানা দর্জীর দোকানে কাজের জন্য নিয়ে গেলেন। দর্জী নাজীরের হাতের কাজের একটু নমুনা দেখতে চাইল। নাজীর দর্জীকে একখানা জামা তৈরী করে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিলেন। তাঁর হাতের কাজ দেখে দর্জী অবাক হয়ে গেল। এমন সুন্দর আর নিপুণ সেলাই ও কাটাইয়ের কাজ বোগদাদের অনেক অভিজ্ঞ দর্জীর পক্ষেও সম্ভব কিনা তা সন্দেহের বিষয়।

দর্জী নাজীরের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মাসিক পনেরো দীনার মাহিনায় নিজের দোকানে বহাল করে নিল।

বাদশাজাদা নাজীর তাতেই খুশী।

কালের কুটিল গতি অনুসরণ করা শক্ত। তার গতির সঙ্গে সঙ্গে কারো অদৃষ্ট হয় সুপ্রসন্ন, কারো বা অপ্রসন্ন। যেমন বৃদ্ধ আবদুল্লা আর মালিক নাজীর—দুজনেরই ভাগ্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল।

বৃদ্ধ স্বভাবতই একটু রগচটা মেজাজের মানুষ ছিলেন। নিজের

মতের সঙ্গে অপরের মতের একটু গরমিল হলেই প্রতিপক্ষের ওপর বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। সেই কাণ্ডই ঘটে গেল সেদিন।



কোনও কারণে পত্নীর ওপর ভয়ংকর রকমের চটে উঠে তিনি অসতর্ক মুহূর্তে তাকে তালাক্ দিয়ে বসলেন।

তালাক্ পেয়ে সেই রাত্রেই আবদুল্লা-গৃহিণী স্বামীর ঘর ছেড়ে পিতৃগৃহের দিকে পা বাড়াল।

পরদিন বৃদ্ধের রোষানল শান্ত হলে তিনি নিজের ভুল বুঝে যারপর নাই অনুতপ্ত হলেন। কিন্তু পত্নীকে ফিরে পাবার আর কোন উপায় তখন ছিল না। বৃদ্ধ আবদুল্লা তখন স্থানীয় কাজী সাহেবের শরণ নিলেন।

কাজীসাহেব বললেন, 'আবদুল্লা সাহেব, এ দেশের রীতি-নীতি তো আপনার অজানা নয়। আপনার তালাক দেওয়া বিবিকে আবার শাদী করতে হবে অন্য একজনকে। পরে এই নতুন খসম

তার নতুন বিবিকে তালাক দিলে, বিবি ইচ্ছা করলে তখন আবার আপনাকে শাদী করে আপনার ঘরে যেতে পারে। তার আগে নয়।'

বড়ই ভজ কট ব্যাপার। অথচ না মেনেও উপায় নেই।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর বৃদ্ধ আবদুল্লা নাজীরকেই এই কাজে জড়ানো যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। নাজীর তাঁর প্রিয়পাত্র এবং স্বভাবেও সৎ।



অতঃপর নাজীরকে ডেকে সেই মতই ব্যবস্থা করলেন বৃদ্ধ। তার সঙ্গেই দ্বিতীয় বার বিবাহ হলো বৃদ্ধের পত্নীর।

মজা শুরু হলো এইবার।

নাজীর এবং বৃদ্ধের চতুর্থ পত্নী আয়েশা দুজনের কেউই ইতিপূর্বে কাউকে দেখেনি। নাজীর ভেবেছিলেন, বৃদ্ধের পত্নী যখন—তখন বৃদ্ধাই সে হবে। বৃদ্ধা না হলেও অন্তত

প্রৌঢ়া তো হবেই। আর আয়েশা ভেবেছিল—দর্জীর দোকানের চাকর যখন—তখন রূপ-গুণ-বিদ্যা-বুদ্ধিতে কতই বা আর উন্নত হবে? বয়সও কোন না হবে বছর চল্লিশ।

কিন্তু বাসরঘরে দুজনকে দেখে দুজনের চমক লাগল। কী সুন্দর দেখতে দুজনকে। দুজনেই স্থির করল কেউ কাউকে ত্যাগ করবে না।

পরদিন প্রভাতে বৃদ্ধ আবদুল্লা এসে নাজীরের সিদ্ধান্তের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

মহা সংকটেই পড়ে গেলেন। তিনি তখন আয়েশার কাছে গিয়ে



তাকে ফিরে আসার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি···অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু আয়েশার মন তাতে টলল না।

বৃদ্ধ তখন কাজীর কাছে ছুটলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁকে নিরাশ হতে হলো।

হতাশ এবং ভগ্ন মনে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন আবদুল্লা। আর এসেই এতবড় শোক ও বেইমানী সহ্য করতে না পেরে

অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমে সেই অসুস্থতা বেড়ে গিয়ে তাঁর জীবনের অন্তিমকাল এসে উপস্থিত হলো। বৃদ্ধ এই সময়ে শেষবারের মত নাজীরের দেখা পেতে চাইলেন।

নাজীর এলেন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বৃদ্ধ সকাতরে তাঁকে বললেন, 'নাজীর! আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর বেশীক্ষণ বাঁচব না আমি। যাবার সময়ে তোমার অপরাধ আমি মাফ করে গেলাম। তোমার আর দোষ কি? সবই খোদার মর্জি। কারণ খোদার কাছে আমিই প্রার্থনা করেছিলাম তখন এই বলে যে, হে খোদা, ইহজগতে আমার যা যা প্রিয় বস্তু এবং সম্পত্তি আছে, এই সৎ আর নির্লোভ যুবকটি যেন তার সবগুলিরই অধিকারী হয়। তখন কেন যে ওরকম প্রার্থনা তোমার জন্য করেছিলাম তা জানি না। হয়ত স্বয়ং ঈশ্বরই আমাকে বাধ্য করেছিলেন ঐভাবে প্রার্থনা করতে। যাক সে কথা। তুমি আমার প্রিয়তমা পত্নীকে গ্রহণ করেছ, এইবার আমার তাবৎ সম্পত্তির দখল নিয়ে আমার সেই প্রার্থনাকে সর্বাংশে সফল কর। আমি আমার কথার খেলাপ করে মরতে চাই না।'

এই বলে বৃদ্ধ আবদুল্লা তাঁর বালিশের নীচে থেকে একটি ইচ্ছাপত্র বার করে নাজীরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এই আমার শেষ ইচ্ছাপত্র। সাক্ষী সাবুদ-এর দস্তখৎ সমেত আইন মোতাবেকই এটি সম্পাদন করা হয়েছে। ভয় নেই, তোমায় কোনও রকম ঝামেলায় পড়তে হবে না। আমি তোমায় সর্বান্তঃকরণেই ক্ষমা করেছি এবং খোলা মনেই আশীর্বাদ করছি তুমি সুখী হও।'

এই ঘটনার তিনদিন পরেই বৃদ্ধ দেহত্যাগ করলেন।

কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! বিধির কি বিচিত্র লীলা! অতি অল্পদিনের মধ্যেই নাজীরের সব সুখের অকস্মাৎ অবসান ঘটল। একদিন তিনি সমস্ত দিন বোগদাদ নগরীর মধ্যে আমোদ-আহলাদে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে দেখলেন—বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ। বিস্মিত নাজীর বার বার বন্ধ কপাটে আঘাত করলেন; দাস-দাসীর নাম ধরে বার বার ডাকলেন কিন্তু কেউই তাঁকে দরজা খুলে দিতে এলো না।

মহা অধৈর্য এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে নাজীর তখন দরজা ভেঙে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে আরো অবাক হয়ে গেলেন। একটি জনপ্রাণীও সে বাড়ীতে নেই। স্ত্রী আয়েশার শয়নকক্ষে ঢুকলেন—আয়েশাও নেই। শুধু তা-ই নয় সিন্দুক থেকে টাকাকড়ি পর্যন্ত উধাও।

দুশ্চিন্তায় নাজীরের মন ভরে গেল। তিনি স্ত্রীর শয্যাতেই দু-হাতে মাথা টিপে ধরে মুহ্যমানের মত বসে পড়লেন। চিন্তায় চিন্তায়ই সে রাত যে কখন কাবার হয়ে গেল নাজীর তা বুঝতেই পারলেন না।

পরদিন প্রভাতে নাজীর আশ-পাশের প্রতিবেশীদের কাছে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলেন কিন্তু কেউই তাঁকে কিছু বলতে পারল না। নাজীর হতাশ হলেও হাল ছাড়লেন না। তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করে চললেন এই রহস্যের সমাধান করতে। কিন্তু বিপদ বিপদেরই অনুগমন করে থাকে। সমস্ত ঘটনা কাজী সাহেবের

কানে উঠল। তিনি ভাবলেন, যুবক নিজেই তার বিবিকে হত্যা করে সমস্ত টাকাকড়ি সোনাদানা গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে এখন অপরাধ এড়াবার জন্য এমন শোক প্রকাশের অভিনয় করছে। তাই কাজী সাহেব নাজীরকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। অবশ্য বিচারে নাজীরের দোষ সপ্রমাণ করা গেল না বলে তিনি মুক্তি পেলেন।

কারাগার যখন থেকে মুক্তি পেলেন তখন তিনি সর্বস্বান্ত। কাজেই বাধ্য হয়ে তাঁকে সেই ওস্তাগরী বৃত্তি নিতে হলো।

দিন যায়। নাজীরের শোকাগ্নি আগের চেয়ে অনেক শান্ত। দুঃখ কষ্টও আগের চেয়ে কম। একদিন তিনি দর্জীর দোকানে বসে নিজে মনেই কাজ করছেন এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সামনের পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নাজীরকে লক্ষ্য করে। বাদশাজাদা নাজীর না? চেহারায় কিছু পরিবর্তন ঘটে গেলেও লোকটি তাঁকে চিনতে অসুবিধা বোধ করল না।

নাজীরও তাঁকে চিনলেন। কায়রোর সেই মুস্তাফা দর্জী। যার কাছে তাঁর ওস্তাগরী বিদ্যায় হাতেখড়ি।

দুজনে দুজনকে দেখে খুব আনন্দ পেলেন। কথায় কথায় প্রকাশ পেল যে, মিশরের তখত এখন শূন্য; কেন না মালিক আশরাফ আর বেঁচে নেই।

মুস্তাফা বলল, 'হুজুর! আর দেরী করবেন না। তখত খালি পড়ে রয়েছে। বেশীদিন খালি রাখাও ঠিক নয়; কারণ শত্রু ওৎ পেতে রয়েছে চারিদিকে। আমীর ওমরাহরা আপনার সন্ধানেই রয়েছেন। আপনি সময়মত না গেলে তাঁরা বাধ্য হবেন অন্য কাউকে তখতে বসাতে। আপনি আমার সঙ্গে আজই কায়রোয় ফিরে চলুন।'

যথাকালে কায়রো পেঁছে পিতার আমলের অনুগত আমীর ওমরাহদের সহায়তায় মিশরের সিংহাসন অধিকার করলেন মালিক নাজ'র। সিংহাসনে বসেই প্রথম যে সৎকাজটি তিনি করলেন তা হলো বৃদ্ধ ওস্তাগর মুস্তাফাকে উজীরের পদমর্যাদা দেওয়া। কিন্তু মুস্তাফা সবিনয়ে নাজীরের কৃতজ্ঞতার দান ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'বাদশা! আপনার অনুগ্রহের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনি মহৎ বংশের সন্তান, নিজে মহৎ তাই মহতের মতই কাজ করেছেন। কিন্তু আমি তো নিজের যোগ্যতার কথা জানি। আমি ওস্তাগরীতে পটু কিন্তু উজীরীতে নই। আমি এ রাজ্যের উজীর হলে দেশের ও দশের হিতে-বিপরীতে ঘটে যাবে আমার অযোগ্যতা ও অনভিজ্ঞতার দরুণ। সে আমি হতে দিতে পারি না। তারচেয়ে আপনি বরং আপনার পরিবারবর্গের, আপনার দরবারীগণের এবং স্বয়ং আপনার নিজের পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত করার ভার একমাত্র আমাকেই দিন। তাহলেই আমি খুশী হব।'

বাদশা নাজীর দর্জী মুস্তাফার সারল্যে পরম সন্তুষ্ট হয়ে সেই রকম ফরমানই জারী করলেন তাঁর রাজ্যে। এ ছাড়াও দোকান সাজাবার ও বাড়াবার জন্য আরও কিছু অর্থ তাকে পুরস্কার হিসেবে দিলেন।

দরবারে একদিন বসে আছেন বাদশা নাজীর। ওমরাহদের সঙ্গে নানান বাক্যালাপ করছেন, এমন সময় জনৈক কাজী এসে কুর্ণিশ

করে সেখানে দাঁড়াল।

করজোড়ে নিবেদন করল ঃ 'জাহাঁপনা! সম্প্রতি একজন খৃষ্টান সওদাগরের হত্যা-অপরাধে তিন ব্যক্তিকে বন্দী করে আমার কাছে আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন নিজের নিজের অপরাধ কবুল করছে। কিন্তু তৃতীয় জনের আচরণ বড়ই অদ্ভুত। সে বলছে, যদিও সে সেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয় তবুও তার মত পাপীর নাকি প্রাণদণ্ডই হওয়া উচিত। আমি তো তার কথার মর্ম কিছুই বুঝতে পারিনি। তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনিই ঐ লোকটির বিচার করুন, হুজুর।'

বাদশা কাজীর কথা শুনে বিশেষ কৌতুহলী হয়ে উঠলেন এবং সেই লোকটিকে দরবারে হাজির করতে আদেশ দিলেন কাজীকে।

বাদশার হুকুমে লোকটিকে দরবারে এনে হাজির করা হলো। তাকে দেখেই বাদশা চিনতে পারলেন। তিনি যখন বৃদ্ধ আবদুল্লার প্রাসাদে তাঁরই ইচ্ছাপত্রের বলে পত্নী আয়েশাকে নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, এই লোকটিই সেই সময়ে তাঁদের নফর হিসাবে কাজ করছিল।

বাদশা যে তাকে চিনতে পেরেছেন সে ভাব সম্পূর্ণ গোপন করে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত বললেন, 'তুমি ঐ খৃষ্টান সওদাগরকে কেন হত্যা করেছ? তখন কি ভাবনি যে, পাপ কখনো চাপা থাকে না, ধরা তুমি পড়বেই? আর তার যথাযোগ্য শাস্তিও তোমায় পেতে হবে?'

লোকটি কাতর কণ্ঠে জবাব দিল, 'না না জাহাঁপনা, আমি আদৌ কোনো হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নই। তবুও প্রাণদণ্ডই যে আমার উপযুক্ত শাস্তি, আমার ইতিহাস শুনলেই আপনি তা

সঠিক বুঝতে পারবেন। আপনার অনুমতি পেলে আমি এই ভরপুর দরবারে আমার সেই পাপের ইতিহাস প্রকাশ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।'

অতঃপর বাদশার অনুমতি পেয়ে লোকটি বলতে আরম্ভ করল—'জাহাঁপনা! বিখ্যাত বোগদাদ নগরীতে আমার জন্ম। আমি সেখানে নাসির নামে এক যুবকের নফর ছিলাম। তাঁকে দেখতে ভারী সুন্দর ছিল। মাফ করবেন হুজুর; অনেকটা যেন আপনার মতই। যুবক প্রথমে দর্জীর কাজ করতেন পরে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। তিনি একজন বৃদ্ধ আরব-সওদাগরের তালাক দেওয়া বিবিকে শাদী করে অপরিমিত ধন-সম্পদের অধিকারী হন। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন পরম রূপবতী। মিঞা-বিবির সুখেই দিন কাটছিল। কিন্তু ঐ রমণীর বেইমানীতেই যুবকের সুখের সংসারে আগুন লাগল। মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর বিবি একদিন আমায় একান্তে ডেকে বললেন, আর তিনি এ সংসারে থাকতে চান না। তাঁর স্বামী নাকি রোজ রাতে মাতাল হয়ে এসে তাঁকে মারধর করে। তিনি বাপের বাড়ি যেতে চান। আমি যদি তাঁকে সাহায্য করি তবে তিনি আমায় বিশেষ পুরস্কার দেবেন।

তাঁর কথায় আমার মন ভিজে গেল। সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। একদিন সুযোগ এল।

আমার প্রভু তাঁর বিবিকে সেদিন বলে গেলেন; সারাদিন তিনি বাড়ি থাকবেন না—সন্ধ্যার পর ফিরবেন। শুনে আমাদের আর আহলাদের অবধি রইল না। কিন্তু অন্যান্য দাস-দাসীরা মঞ্জিলে থাকলে আমাদের অভিলাষ সিদ্ধিতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটবে বুঝে

বিবিজী প্রত্যেককেই প্রত্যেকের অগোচরে কিছু না কিছু কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। আর আমাদের কোনও প্রতিবন্ধক রইল না। আমরা যাবতীয় টাকাকড়ি আর সোনাদানা নিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে গেলাম।

'সেদিন গোটা রাত তারপর দিন দুপুর পর্যন্ত একটানা পথ হেঁটে আমরা দুজনেই নিদারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। চলতি পথে সহসা একটি মনোরম সরোবর নজরে পড়ল। আমরা সেই সরোবরের তীরেই যাত্রাভঙ্গ করে বিশ্রামের আয়োজন করলাম।

বিশ্রাম নিতে নিতে সরোবরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, হঠাৎ গাছপালার আড়ালে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম। ভারী চমৎকার প্রাসাদ। কোনও ধনীর হবে নিশ্চয়ই—ভাবলাম। একটু পরেই এক যুবক জনাকয়েক নফরকে নিয়ে সেই প্রাসাদ থেকে বের হলেন এবং সরোবরের দিকেই আসতে লাগলেন। দুজন নফরের কাঁধে মাছ ধরার জালও রয়েছে দেখলাম।

'আগন্তুকের মুখোমুখি হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমাদের ছিলনা তাই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে সরে পড়ার চেষ্টা করলাম। সফল হলো না সে চেষ্টা। তার আগেই তারা আমাদের দেখে ফেলল। যুবক এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। সুন্দর চেহারা, সুন্দর পোষাক। দেখলেই অভিজাত ও ধনী পরিবারের সন্তান বলে বোধ হয়।

'যুবক প্রথমে আমাকে পরে বিবিজীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করে পরে বিবিজীর দিকে চেয়ে স্মিত হেসে বললেন, 'সুন্দরী! আমি বসোরার সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার নাম শাহজাদা জাফর। আমি এই প্রাসাদেই বাস করি। তোমাকে দেখে খুবই

পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। ইচ্ছা করলে আমার মেহমান হয়ে আমার প্রাসাদে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে শ্রান্তি দূর করতে পার।'

শাহ্জাদা যে দৃষ্টিতে বিবিজীর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বিবিজীও যে দৃষ্টিতে শাহজাদাকে দেখেছিলেন তাতে আমার বিপদের সম্ভাবনা বোধ হলো। আমি তাঁর ঐ প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করার আগেই বিবিজী তাঁর কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

অগত্যা আমাকেও যেতে হলো তাঁদের পিছন পিছন। একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলেন তাঁরা। আমায় কিন্তু সেই কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ নেওয়া হলো। তাঁরা কক্ষে প্রবেশ করে দু'জনে দু'টি আসনে বসে নানা রকম বাক্যালাপ করতে



শুরু করলেন। আমি দূরে বাইরে বারান্দায় থাকায় কয়েকটি অস্ফুট শব্দ আর কিছু কিছু হাসির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু

শুনতে গেলাম না। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটাবার পর মনে মনে যখন বিরক্তি ও উদ্বিগ্নতা বোধ করছি; সেই সময় শাহজাদার এক ভৃত্য এসে তাঁদের এবং সেই সঙ্গে আমাকেও আহারের আমন্ত্রণ জানাল। সকলেই একসাথে আহারের স্থানে উপস্থিত হলাম। 'পরিপাটিরূপেই আহার হলো। অতঃপর শাহজাদা জাফর আমায় পরম বন্ধুভাবেই সুরাপানের জন্য অনুরোধ জানালেন। ভদ্রতাবশতঃ আমি তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। জানিনা সেই সুরায় কি মেশানো ছিল। আমি কয়েক ঢোক সুরা পানের সাথে সাথেই হতচেতন হয়ে পড়লাম।

'পরদিন প্রভাতে যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম, আমি সেই সরোবরের ধারে এক জায়গায় পড়ে আছি। ব্যাপার কিছু বুঝলাম না। বোঝার মত শরীর ও মনের অবস্থাও তখন ছিল না। বড়ই ক্লান্ত আর দুর্বল বোধ করছিলাম নিজেকে। চিন্তান্বিত হয়ে আবার ফিরে গেলাম শাহজাদা জাফরের প্রাসাদে। দরজা বন্ধ ছিল। করাঘাত করলাম কয়েক বার। দরজা খুলল। একটি নফর এসে আমায় উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করল, 'কে তুমি ? এখানে কী চাও ?'

'আমি বললাম, "ভাই, তুমি আমায় চিনতে পারছ না ? কাল যে মহিলাটি শাহজাদা জাফরের মেহমান হয়ে এ প্রাসাদে এসেছিলেন আমি তাঁরই সঙ্গী।"

নফর গম্ভীর মুখে সাফ জবাব দিল, "তুমি ভুল করছ। কাল কোন মহিলাই আমাদের হুজুরের প্রাসাদে মেহমান হয়ে আসেন নি।" —এই বলে সে আমার মুখের ওপর পুনরায় দরজা বন্ধ করে দিল।

'আমি তো হতবুদ্ধি! বুঝলাম এর ভিতরে অবশ্যই কোন ষড়যন্ত্র আছে। নাহলে আমাকে সুরাপানে অচৈতন্য করে কেনই বা প্রাসাদের বাইরে রেখে আসবে? আর কেনই বা আমার মালকিনের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করবে? আমার ভীষণ অনুশোচনা হতে লাগল নিজের কৃতকর্মের জন্য।

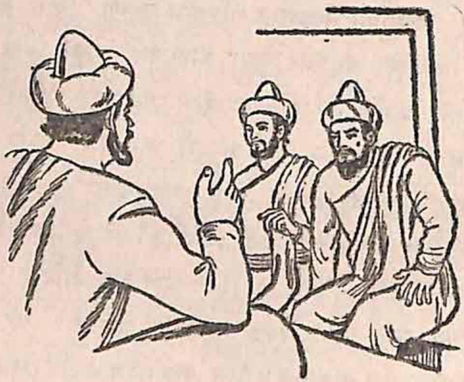
পা. শেষে দুঃখে ও কষ্টে পাগলের মত হয়ে সেই পাপিষ্ঠাকে মনে মনে অসংখ্য ধিক্কার দিতে দিতে সে স্থান ত্যাগ করলাম। মনের যেমন স্থিরতা ছিল না, পথেরও তেমনই স্থিরতা ছিল না। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে মাত্র গতকাল সন্ধ্যাতেই এই কায়রো শহরে এসে পেঁছেছি।

'হজরৎ! সারাদিন পথচলার পরিশ্রমে অশেষ রকমে ক্লান্ত হয়ে কোথাও কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য সারা মন আকুল হয়ে উঠল। কিন্তু অচেনা অজানা জায়গায় কোথায় কার কাছে আশ্রয় নেব তা ভেবে পেলাম না। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। আমি তখনও অন্ধের মত একটু বিশ্রামস্থল, একটু আশ্রয়স্থল খুঁজে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ চলতি-পথে কার যেন এক প্রাণঘাতী আর্তনাদ অন্ধকারে আমার কানে এসে পেঁছল। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। 'অন্ধকারের জন্য প্রথম কিছু দেখতে পাইনি। পরে চোখে অন্ধকার হয়ে এলে দেখলাম দু'জন বদমায়েস একটি লোককে ধরে আঘাতের পর আঘাত করছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পরিশ্রমে আমি তখন খুবই অবসন্ন—দুর্বল। তাই আমি সেই হতভাগ্যকে কোন সাহায্যই করতে পারলাম না। বদমায়েসরা তাকে নির্বিকারে খুন করল। আর আমি নিরুপায় হয়ে তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম।

'তারপর বদমায়েস দুজন পলায়ন করল। ইতিমধ্যে মৃতব্যক্তির

কাতর আর্তনাদে আকৃষ্ট হয়ে জন দুই-তিন শান্তিরক্ষক প্রহরী সেই স্থানে দ্রুত এসে পড়লেন। দুষ্কৃতকারীদের পালাতে লক্ষ্য করছিলেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে অন্যান্য সহযোগীদের সতর্ক করে দিলেন। তারা ধরা পড়ল। সেইসঙ্গে আমাকেও ধরলেন ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকার জন্য। ভাবলেন, আমিও বুঝি হত্যাকারীদের সহযোগী—সময়মত পালাতে পারিনি।

'হুজুর! অকপটে সব প্রকাশ করলাম। আমি ঐ খৃষ্টান সওদাগরের হত্যাকাণ্ডের অপরাধে বিন্দুমাত্র অপরাধী নই। আমি আমার মনিবের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা আর অন্যায় করেছি,



শুধু সেই অপরাধে আপরাধী। আর আমার নিজের বিবেকের বিচারে সে কারণে আমার প্রাণদণ্ডই বিধেয়।'

বাদশা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অবশেষে বললেন, 'যুবক! তোমার অপরাধের জন্য—প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়াই আমার উচিত ছিল বটে কিন্তু যেহেতু তুমি অনুশোচনায় দগ্ধ এবং সে অনুশোচনা

যথার্থ ও অকৃত্রিম তাই আমি তোমায় কেবল ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করেই মুক্তি দিচ্ছি। যাও।'

যুবক বাদশা নাজীরকে কুর্নিশ করে দরবার গৃহ ত্যাগ করল।

পৃথিবী বিখ্যাত বাদশা হারুণ-অল-রশিদের মত বাদশা নাজীরও নিজের চোখে প্রজাদের অবস্থা দেখবার ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশে গভীর রাত্রিতে শহরে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন রাত্রে তিনি এইভাবেই ঘুরছেন। জনকয়েক বিশ্বস্ত ও সাহসী অনুচর ছায়ার মতই তাঁকে অনুসরণ করছে পিছন থেকে। এমন সময় সেই নিশীথ রজনীতে একটি রমণীর করুণ কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এসে বাজল। রমণী যেন শোকে আকুল হয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

এত রাতে কে কাঁদে? কেন কাঁদে? এ কান্না কি রোগ যন্ত্রণার? কোন মৃতের জন্য? নাকি আঘাতের বেদনার? জানতে কৌতূহল হলো বাদশার। তিনি শব্দ অনুসরণ করে বুঝতে পারলেন, সম্মুখস্থ একটি বৃহৎ অট্টালিকার অভ্যন্তর থেকেই ঐ কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বাদশা নাজীর এই কান্নার কারণ জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে জনৈক পার্শ্বচরকে অট্টালিকার বন্ধ দরজায় আঘাত করতে আদেশ করলেন।

দরজায় আঘাতের শব্দ শুনে কিছুক্ষণ পরে একটি ভৃত্য শ্রেণীর লোক এসে দরজা খুলে দিল এবং বাদশার পার্শ্বচরদের সশস্ত্র অবস্থায় দেখে, সে আর ভয়ে কোন প্রতিবাদ না করে একপাশে

সরে দাঁড়াল। বাদশা নাজীর দাসকে এই কান্নার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে তাদের পথ দেখিয়ে একটি কক্ষের সামনে এনে হাজির করল।

ঘরের ভিতরকার যে দৃশ্য বাদশা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময় চরমে উঠল।

তিনি দেখলেন, দুটি জোয়ান চেহারার হাবসী খোজা একটি রূপবতী নারীকে ক্রমাগত বেত্রাঘাত করে চলেছে। একজন সুন্দর যুবা পুরুষ একটু তফাতে বসে হিংস্র উল্লাসে রমণীটির সেই নিগ্রহ দৃশ্য উপভোগ করছে। কান্না এই রমণীরই। তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাপ্লুত।

জনাকয়েক সশস্ত্র পুরুষকে সেই কক্ষে করতে দেখে হাবসী খোজারা তাদের বেত্রাঘাত বন্ধ করল এবং যুবক দুই চোখে বিস্ময় আর ক্রোধ নিয়ে আগন্তুকদের পানে ফিরে তাকাল। রমণীকে এক নজরে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন বাদশা। এ সেই আয়েশা। তিনি তখন কৌতুহলী হয়ে যুবককে এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

যুবক প্রথমে তাদের এইকক্ষে অনাহূতভাবে প্রবেশে ক্রুদ্ধ হলো ও কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী নয় বলে জানাল। পরে জনৈক পার্শ্বচরের প্রমুখাৎ বাদশা নাজীরের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে সে নিজের ঔদ্ধত্যের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করে সবিনয়ে বলল, 'হজরৎ! এই স্ত্রীলোকটি আমার বিবি। কিন্তু সে এমনই পাপিনী যে, এর পাপের ফিরিস্তি শুনলে আপনি আমার এই নিষ্ঠুরতাকে কখনোই অসঙ্গত ও অন্যায় বলে মনে করবেন না।

'আলমপনা! আমি বসোরার সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার

নাম জাফর। বোগদাদ নগরী থেকে কিছুদূরে এক সরোবরের ধারে উদ্যানের মধ্যে আমার নিজস্ব একটি প্রাসাদ আছে। আমি বেশীর ভাগ সময়ই সঙ্গী-সাথী ইয়ার-বক্সী আর বান্দা-বাঁদীদের নিয়ে সেই প্রাসাদে আরামে-বিলাসে দিন কাটাতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন ভৃত্যকে নিয়ে সেই সরোবরে মৎস্য শিকারে যাচ্ছি এমন সময়ে এই রমণীকে দেখতে পেলাম। এর সঙ্গে একটি লোক ছিল, তাকে দেখে এর অনুচর বলেই বোধ হলো। আমি এই রমণীকে বিশেষ ক্লান্ত অবসন্ন ও ক্ষুধার্ত দেখে আমার প্রাসাদে বিশ্রাম নিতে ও পান ভোজন করতে অনুরোধ করলাম। এ তাতে রাজীও হলো।

'যথাযোগ্য আদরে রমণীকে আমার প্রাসাদে এনে, তাকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে এক সময় পরিচয় জানতে চাইলাম। রমণী জানাল তার নাম আয়েশা, তার পিতা বোগদাদের একজন গণ্যমান্য রাজ কর্মচারী। তিনি একজন বৃদ্ধ অথচ অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির সঙ্গে তার শাদীর বন্দোবস্ত করায় নিরুপায় হয়ে সে একজন বিশ্বস্ত নফরকে নিয়ে পিতৃগৃহ হতে পলায়ন করে এসেছে। তার গন্তব্য ছিল বসোরা নগরী।

আমি আয়েশাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম, সে যদি রাজী থাকে তবে আমি স্বয়ং তাকে শাদী করতে প্রস্তুত আছি। বংশ গরিমা আমারও কিছু কম নয়। আমিও আমার পরিচয় দিলাম তাকে।

'আয়েশা সম্মত হলো আমাকে শাদী করতে। সেই সঙ্গে অনুরোধ করল, সঙ্গের নফরটির বিশ্বস্ততার সম্পর্কে তার মনে বিশেষ সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। হয়ত সে পথিমধ্যেই আকৃষ্ট হয়ে

সুযোগ বুঝে তার সর্বনাশে উদ্যত হবে, না হয় সে তার পলায়নের খবর তার পিতাকে জানাবে। সুতরাং সর্বাগ্রে এই নীচাশয় লোকটিকে হত্যা করে নিজের পথ কণ্টকমুক্ত করা দরকার।

আমি আয়েশার কথায় সায় দিলাম বটে কিন্তু বিনা কোনও অপরাধে কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভরশীল কারো অনুরোধে ব্যাচারিকে হত্যা করতে আমার মন রাজী হলো না। আমি তাই সেই ভৃত্যটিকে মাদকদ্রব্য পান করিয়ে তাকে হতচেতন করে আমার প্রাসাদ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলাম আমার অনুচরবর্গকে। তারপর দু-এক দিনের মধ্যেই আয়েশাকে নিয়ে ঐ প্রাসাদ পরিত্যাগ করে বসোরায় গিয়ে আয়েশাকে বিবাহ করে পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগলাম।

'বেশ মসৃণ গতিতেই চলছিল আমাদের সুখের দিনগুলি। এমন সময় হঠাৎই এক অকল্পনীয় বিপদ এসে হাজির হলো আমাদের রাজ বংশের সামনে। কি কারণে জানি না বোগদাদের সুলতান আমাদের সুলতানকে সবংশে ধ্বংস করে বসোরার সিংহাসন দখল করবার জন্য নাকি সৈন্য সজ্জা শুরু করে দিয়েছেন বলে সংবাদ পেলাম। প্রাণে ভয় ঢুকে গেল আমার। নৃশংসভাবে শত্রুপক্ষের হাতে নিহত হওয়ার আশঙ্কায় একরাত্রে যা-কিছু মূল্যবান সম্বল ছিল, সমস্ত নিয়ে আয়েশাকে নিয়ে ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করলাম ও ঘুরতে ঘুরতে এই নগরীতে এসে স্থিত হলাম।

'এখানেও সুখে-দুঃখে আমাদের দিন কেটে যাচ্ছিল। নিজেদের ভরণ-পোষণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বৃত্তির দরকার। আমি তাই সওদাগরী বৃত্তি গ্রহণ করলাম। ফলে আমায় প্রায়ই বাড়ীতে অনুপস্থিত

থাকতে হতো। পাপীয়সী আয়েশার অন্তরে যে পাপ এতদিন সুযোগ ও সুবিধার অভাবে মাথা লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, একবার তা মাথাচাড়া দিয়ে জেগে উঠল। গোপনে সে শহরের উচ্ছৃঙ্খল আর বদমাস যুবকদের সঙ্গে সে আমোদে মেতে উঠল। শুধু তা-ই নয়, নিজের অদম্য আমোদ বাসনা মেটাবার তাগিদে শেষ পর্যন্ত আমার বাড়ীতেই নফরদের স্বারস্থ হলো। এমনকি একজনকে প্ররোচিত পর্যন্ত করল আমার জীবননাশের। কিন্তু খোদা মেহেরবান! আমার সেই নফরটি খুবই সৎ, সাধু এবং বিশ্বস্ত হওয়ায় সে আয়েশার বিষয়ে অকপটে সবকিছু আমার কাছে ব্যক্ত করেছিল।

আমি হয়তো হত্যাই করে ফেলতাম দুশ্চরিত্রাকে কিন্তু একদিন তো ওকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলাম। সেই ভালবাসার খাতিরেই আয়েশাকে প্রাণে মারতে পারলাম না। ওর প্রতি একশো ঘা কোড়ার বন্দোবস্ত করলাম প্রতিদিন। যাতে পাপিনী তিলে তিলে বুঝতে পারে তার পাপের ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম কত ভয়ানক।

বাদশা নাজীর এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিলেন যুবকের কাহিনী। যুবক স্তব্ধ হলে তিনি বললেন. শাহজাদা জাফর! তুমি কোনও অন্যায় করনি। তবে আয়েশার শাস্তিটাও উপযুক্ত হয়নি। গুরু পাপে লঘু দণ্ড হয়েছে। ওর একমাত্র দণ্ড মৃত্যুদণ্ড। ওর মত ডাকিনী বেঁচে থাকলে অনেক সুখের সংসারেই দুঃখের আগুন জ্বলে উঠবে। অনেক নিরপরাধী প্রাণই বিনষ্ট হবে ওর খেয়ালি-খেলায়। সুতরাং আমি বাদশা নাজীর স্বয়ং তোমাকে হুকুম করছি—ঐ কালসাপিনীকে এই মুহূর্তে জলে ডুবিয়ে হত্যা কর।'

বাদশার আদেশ মতোই কাজ হলো। আয়েশাকে জলে ডুবিয়ে মারা হলো। কিন্তু ঐ দুষ্ট চরিত্রা রাক্ষসী মৃত্যুর পরেও তার শেষ কামড় দিতে ভুল করল না। আয়েশার মৃতদেহ নদীর জলে ভাসতে ভাসতে এক ভয়ানক বনের কাছে এক গাছের শিকড়ের সঙ্গে আটকে গেল। সেই নদীতে বহু জলচর মাংসাসী প্রাণী ছিল...সেই বনে বহু হিংস্র বন্য জানোয়ার ছিল কিন্তু কেউ তারা পাপীয়সী রমণীর মৃতদেহ স্পর্শ করল না। ঐ দেহ পচতে লাগল। দুর্গন্ধ ছড়াল। জল বিষাক্ত করল। ফলে সেই বনের পশুপাখী এবং বনের ধারে যে নগরী ছিল, সেই নগরীর বহু লোক ঐ দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু সেবনে ও বিষাক্ত জল পানে অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারাল।

উজীরের বুদ্ধি

অতি প্রাচীনকালে পারস্যদেশের অধীশ্বর ছিলেন সুলতান সবুক্তগিন। নানান রাজোচিত গুণাবলীতে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। কেবল একটি মাত্র দোষ ছিল তাঁর। অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন তিনি। অবশ্য এটাকে যদি দোষ হিসেবে ধরা যায়, তবেই। রাজকার্যে সবুক্তগিনের আদৌ মন ছিল না। উজীর ওমরাহদের ওপর রাজ্যের দেখাশোনার সব ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি শুধু মৃগয়াতেই মত্ত থাকতেন। ফলে যা হবার তাই হলো। সুলতানের অনুপস্থিতি ও অমনোযোগিতার দরুণ রাজ্যময় নানান অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দিল। যাঁরা শক্তিমান আর বুদ্ধিমান তাঁরাই হলেন লাভবান, মরার মধ্যে মারা পড়ল নিরীহ প্রজারাই। একজন কনিষ্ঠ উজীরই যা ছিলেন সৎ ও সুবুদ্ধিযুক্ত। কিন্তু তাঁর একার প্রচেষ্টাতে কতটুকুই বা আর প্রতি-

বিধান হতে পারে ? তিনি এবং তাঁরই অনুগামী আরো দু-একজন অনেক চেষ্টা করলেন সুলতানের মন ও দৃষ্টি এই সমস্ত ঘটনাবলীর দিকে ফেরাতে—সুলতানকে মৃগয়াসক্তি থেকে দূরে রাখতে, কিন্তু সফল হলেন না। ফলে ক্রমশই তাঁরা হতাশা বোধ করতে লাগলেন। সামনা সামনি প্রভুকে তাঁর দোষের কথা বলা কঠিন এবং বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাতে হিতে-বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সুলতান রেগে গিয়ে তক্ষুণি তাঁর গর্দান নিতে পারেন। তাই উজীর কাসেমালি কৌশলে কার্যোদ্ধারের মতলব আঁটলেন।

একদিন তিনি স্বয়ং সুলতানের সঙ্গে মৃগয়া গমনের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সুলতান খুবই খুশী হলেন তাঁর প্রস্তাবে। পরের



দিনই কাসেমালিকে নিয়ে সবুক্তগিন নির্গত হলেন তাঁর প্রিয় শিকারখেলায়। লোক-লস্কর নিয়ে চলেছেন তাঁরা। কাসেমালির ভাগ্যগুণেই কিনা কে জানে, যাত্রার গোড়াতেই দু-চারটে ভাল ভাল

শিকার করলেন সুলতান। ফলে তাঁর মন খুবই প্রফুল্ল ছিল। সুযোগ বুঝে কাসেমালি এক সময়ে বললেন, 'জানেন মালিক; আমি একটা গুপ্তবিদ্যা জানি। এতদিন প্রকাশ করিনি কারণ তার দরকার পড়েনি। আজ আপনার সঙ্গে এই গহন বনে শিকার খেলতে এসে বিদ্যাটা জাহির করতে খুব মন চাইছে।'

উজীরের কথায় আশ্চর্য হয়ে সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন; 'তুমি গুপ্তবিদ্যা জান! বলো কি! কী সেই বিদ্যা?'

কাসেমালি সবিনয়ে এবং সলজ্জে জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে এক ওস্তাদ জাদুকরের কাছে পক্ষীবিদ্যা শিখেছিলাম কয়েক বৎসর পূর্বে। তাঁর দেওয়া মন্ত্রের গুণে পাখীর ভাষা আমি ঠিক মানুষের ভাষার মতই বুঝতে পারি।'

সুলতান কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজী হলেন না তাঁর উজীরের কথা। কাসেমালি তখন প্রমাণ দিতে প্রস্তুত হলেন।

সারাটা দিন মৃগয়ায় কাটল ঘোর উত্তেজনা আর অসম্ভব পরিশ্রমের মধ্যে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে বনের পথ ধরে রাজধানী অভিমুখে তাঁরা ফিরছেন, সেই সময় পথে একটি বৃক্ষ-কোটরে দুটি প্যাঁচাকে বসে থাকতে দেখে উজীরের গুপ্তবিদ্যার কথা সহসা মনে পড়ে গেল সুলতান সবুক্তগিনের। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁকে ডেকে তার সেই বিদ্যার প্রমাণ চেয়ে বসলেন।

সুলতানের আদেশ পেয়ে কাসেমালি ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে গেলেন সেই বৃক্ষ পর্যন্ত তারপর তার তলদেশে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে

প্যাঁচা দুটির ডাক শুনতে লাগলেন একমনে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন কাসেমালি। তাঁর মুখভাব রীতিমত গম্ভীর।

তিনি সুলতানকে কুর্নিশ করে বললেন, 'জাহাঁপনা। আমার ওস্তাদের কৃপায় আমি ওদের কথাবার্তা শুনে যা বুঝতে পারলাম তাতে বোধ হলো ওরা আপনাকে লক্ষ্য করেই নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছে। কিন্তু আপনার কাছে সেকথা প্রকাশ করতে আমার সাহস হচ্ছে না।'

কাসেমালির কথায় সুলতানের ঔৎসুক্য বেড়ে গেল। তিনি তাঁকে অভয় প্রদান করলেন। তখন উজীর বলতে লাগলেন, 'হজরৎ! ঐ প্যাঁচা দুটির একটির ছেলের সঙ্গে আরেকটির মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। বরকর্তা কন্যাকর্তাকে বলছে ঃ "ভাই; যদি তুমি যৌতুক হিসেবে আমাকে গোটা পাঁচেক উচ্ছন্নে যাওয়া নগরী—(যেখানে নগরী ধ্বংস হয়ে বন-জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে, মানুষজন ভিটে ছেড়ে পালিয়েছে) দিতে পার তবেই তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে রাজী আছি। নইলে নয়।"

জবাবে কন্যাকর্তা জানাল ঃ "ভাই, এ তো অতি সামান্য কথা। পাঁচটা কী বলছ, আমি এই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তোমাকে পঁচিশটা উচ্ছন্নে যাওয়া নগরী দান করতে পারি। সুলতান সবুক্তগিন দীর্ঘায়ু হোন। তিনি যতদিন পারস্যের সিংহাসনে বসে থাকবেন ততদিন উচ্ছন্ন-নগরীর কোন অভাব থাকবে না।"

মালিক! এই ধরনের কথাবার্তাই বলাবলি করছিল ওরা।

সুলতান যেমন বুদ্ধিমান তেমনই চতুর ছিলেন। তিনি কাসেমালির

কথা শুনেই বুঝতে পারলেন সে তাঁকে কৌশলে হিতোপদেশ দিচ্ছেন। সত্যই তো! তিনি মৃগয়া নিয়ে এতই মত্ত যে রাজ্যের ভাল মন্দের কোন খবরই রাখেন না বহুদিন ধরে। রাখার ফুসরৎ কোথায় তাঁর? রাজ্যের অবস্থা যে এত শোচনীয় আর ঘোরালো হয়ে উঠেছে তা তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি।

সুলতান আর কোন মন্তব্য না করে নীরবেই ফিরে এলেন রাজধানীতে। তার পরদিন থেকেই তাঁর মধ্যে ঘটল এক আশ্চর্য পরিবর্তন। তিনি মৃগয়া এবং অন্যান্য বিলাসব্যসন পরিত্যাগ করে রাজকার্য ও প্রজাপালনে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। অবশেষে তাঁর ঐকান্তিক যত্ন ও প্রচেষ্টায় তাঁর নষ্টপ্রায় সাম্রাজ্য আবার নতুন করে শ্রী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। প্রজারা আবার সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

সন্ন্যাসী ও শয়তানের গল্প

অনেক দিন আগে ভারতবর্ষের যশপুর রাজ্যে বারমিসা নামে এক সন্ন্যাসী বাস করতেন। একটি গ্রামের শেষে তাঁর কুটির ছিল। সেখানেই তিনি দিনরাত তাঁর সাধন-ভজন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর মধ্যে এক অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়েছিল, যার ফলে তিনি যত কঠিন আর জটিল ব্যাধিই হোক না কেন, অনায়াসেই সেই ব্যাধিগ্রস্থ রোগীটিকে সত্বর নিরাময় করে দিতে পারতেন। এই কারণে তাঁর নাম দেশ বিদেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়ে পড়েছিল। অসংখ্য ভক্তও জুটেছিল।

একবার যশপুরের রাজার মেয়ের দারুণ উৎকট এক ব্যাধি দেখা দিল। রাজ্যের বিভিন্ন চিকিৎসকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও রাজকন্যাকে ব্যাধিমুক্ত করতে পারলেন না। উপায়ন্তর না দেখে রাজা শেষ পর্যন্ত কন্যাটিকে সন্ন্যাসীর কাছে পাঠানোই মনস্থ করলেন।

সেই মতই করা হলো। রাজকন্যাকে পাঠানো হলো সন্ন্যাসী বারসিসার কুটিরে। এইবার ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার। যা আগে কখনো হয়নি···যা হওয়ার অনুমাত্র আশংকাও কেউ করেনি ··· যা একান্ত অসম্ভব কাণ্ড বলেই মনে করত সবাই; সেই ব্যাপারই



ঘটল। সালংকারা রাজনন্দিনীকে দেখে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হলো।

সেই গ্রামেরই অপর প্রান্তের বনে একটি গাছে শয়তান থাকত। সে সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা আর প্রচণ্ড ধর্মানুরাগ দেখে তাঁকে মনে মনে ঘৃণা করত। সর্বদাই ফিকিরে থাকত কি সূত্রে, কোন সুযোগে সন্ন্যাসীর ক্ষতি করা যায়। তাঁকে দিয়ে ঈশ্বরের পরিবর্তে নিজের ভজনা করানো যায়। কিন্তু বাইরে সে বরাবরই আনুগত্য দেখাত তাঁকে।

বহুদিন পরে নিজের মনোবাসনা পূরণের সুযোগ পেয়ে সে সন্ন্যাসীর কানে কানে বলল, 'সন্ন্যাসীঠাকুর! এমন সুবিধে জীবনে আর দু'বার পাবেন না। আপনি অমাত্যদের বলুন যে, রাজকন্যাকে আজ রাত্রে এই আশ্রমেই থাকতে হবে। কারণ তাঁর ব্যাধি অতীব জটিল আর কঠিন। চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনা না করলে রোগমুক্তির সম্ভাবনা নেই। তাই আজ রাজকন্যাকে আশ্রমে রেখে তাঁরা চলে যান। আগামীকাল প্রভাতে এসে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তারপর—তারপর রাজকন্যার অলংকার অপহরণ করতে কতক্ষণ?'

সন্ন্যাসী বারমিসা পরম ধার্মিক ও পরম ঈশ্বরভক্ত হলেও মানুষ তো বটেই। কাজে কাজেই তিনিও সাময়িক ভুল করলেন। চরম ভুল। শয়তানের পরামর্শ গ্রহণ করলেন তিনি।

অলংকার অপহরণ করার পরই বারমিসার মনে তীব্র অনুশোচনা জেগে উঠল। তা দেখে শয়তান খলখল করে হেসে বলল, 'অনুশোচনায় আর ফল কি ঠাকুর? আজ থেকে তুমি একজন শক্তিহীন সাধারণ মানুষ মাত্র। তোমার এই কাজ জানতে পারলে ভক্তেরা তো তোমার গায়ে থুথু তো দেবেই উপরন্তু রাজা তোমার গর্দান না নিয়ে ছাড়বেন না।'

পরিণাম চিন্তা করে সন্ন্যাসী তো ভয়ে অস্থির। একজন সাধারণ মানুষের মত তিনিও প্রাণের ভয়ে কেঁপে উঠলেন। তখন শয়তানের হাতে-পায়ে ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন প্রাণ রক্ষার জন্য।

শয়তান কুটিল হাসি হেসে বলল, 'তোমাকে বাঁচান শক্ত তবু চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু এক শর্তে। তোমাকে আরও একটি

পাপকাজ করতে হবে।'

শিউরে উঠলেন বারমিসা। আরও একটি পাপকাজ! কিন্তু উপায় কি? আগে ইহলোক তার পর তো পরলোকের চিন্তা। সাত-পাঁচ ভেবে রাজী হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী।

তখন শয়তান বলল, 'শোন সন্ন্যাসীঠাকুর! তুমি এই রাজকুমারীকে হত্যা করে ফেল। তারপর মৃতদেহ আশ্রমের এক কোণে পুঁতে দাও। আগামীকাল প্রভাতে যখন রাজার লোকেরা রাজকন্যাকে নিতে আসবে তখন তাদের 'রাজকন্যা রোগমুক্ত হয়ে ভোরেই আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেছেন' বলে বিদায় করে দেবে। তারা নিশ্চয়ই তোমার কথা অবিশ্বাস করবে না।'

—'তারপর?' উৎকণ্ঠা ভরে জিজ্ঞাসা করলেন বারমিসা।

—'তারপর আর কি। রাজার লোকেরা রাজধানীতে ফিরে গিয়ে রাজাকে এই সংবাদ দেবে। রাজকুমারীকে না দেখে রাজা লোকজন দিয়ে চারিদিকে অনুসন্ধান চালাবেন। কিন্তু কন্যাকে কোথাও না পেয়ে রাজা শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তাকে ফিরে পাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে খোঁজ-তল্লাস বন্ধ করে দেবেন। অথচ তোমাকে এতটুকুও সন্দেহ করবেন না—তোমার দেশজোড়া খ্যাতি আর ধর্মপ্রাণতার জন্য। তুমি বেঁচে যাবে।'

শয়তানের পরামর্শে সুবুদ্ধি সন্ন্যাসীর তবে কুবুদ্ধি ঘটল। তিনি তার কথামতই কাজ করলেন। রাজকন্যাকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ লুকিয়ে ফেললেন।

কিন্তু তবু শেষ রক্ষা হলো না। আর হলো না একমাত্র শয়তানের জন্যই। প্রতিহিংসাপরায়ণ, ঈর্ষাকাতর শয়তান নিজেই সব সত্য প্রকাশ করে দিল রাজার কাছে।

বারমিসা ধরা পড়লেন এবং রাজকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার হলো।
এবার বিচার।
রাজার বিচারে বারমিসার প্রাণদণ্ডই উপযুক্ত দণ্ডরূপে সাব্যস্ত হলো। যেমন পাপ তেমনই তার প্রায়শ্চিত্ত। শূল প্রস্তুত। বারমিসা প্রস্তুত। এমন সময় শয়তান এসে তাঁর কানে কানে বলল, 'সন্ন্যাসীঠাকুর তোমার জীবনের অন্তিম লগ্ন উপস্থিত। তুমি যদি আমায় তোমার ইষ্টদেবতা হিসেবে স্বীকার করে আমার ভজনা করতে রাজী থাক তবে আমি এই মুহূর্তে তোমার প্রাণরক্ষা করতে পারি।'
বারমিসা কাতরকণ্ঠে বললেন, 'ভাই শয়তান! তুমি যদি আমাকে এই আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পার তবে যাবজ্জীবন আমি তোমাকে গুরুর মত ভজনা করে যাব।'
—'বেশ. আনুরক্তির চিহ্ন হিসেবে তুমি এই মুহূর্তে একবার অন্তত আমার উপাসনা কর তাহলেই আমি তোমাকে শূলদণ্ড হতে শত যোজন দূরে সরিয়ে নিয়ে যাব।'
এক মুহূর্ত চিন্তা করে সন্ন্যাসী বারমিসা সেই শয়তানকেই নিজের ইষ্টদেবতা হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে মনে মনে তার পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন।
শয়তানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। সে অট্টহাস্য করে বলল, 'বারমিসা! আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো। তুই আমার ভজনা করে আজ থেকে নাস্তিক হয়ে গেলি। তোর মুক্তির পথ চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেল। তুই আমার মতই প্রেতযোনী প্রাপ্ত হয়ে চিরদিন ঘুরে বেড়া মহাশূন্যে।' এই বলে সে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সন্ন্যাসী মুহ্যমানের মত বিষণ্ণচিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘাতক এসে তাঁকে শূলে চাপিয়ে দিল।

খলিফা হারুন ও জনৈক ফকিরের কাহিনী

খলিফা হারুণ-অল-রশিদের রাজত্বকালে বোগদাদ নগরীতে জনৈক ফকির বাস করতেন। ঈশ্বর ভজনায় তাঁর কেমন দখল ছিল তা বলা যায় না, কিন্তু তিনি যে ভোজনে যথেষ্ট দড় ছিলেন; সে কথা সর্বাবাদীসম্মত।

একদিন তিনি প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টা করলে দ্বাররক্ষীরা তাঁকে বাধা দিল। ফকির বিমুখ হয়ে বললেন; 'বাদশার সঙ্গে মুখোমুখি মোলাকাতের ইচ্ছা আমার ছিল কিন্তু তোমরা যখন সে ইচ্ছায় বাদ সাধলে তখন বাদশাকে বলো যে, তিনি যেন আজ আমাকে অতি অবশ্যই এক হাজার সোনার দীনার পাঠিয়ে দেন।'

দ্বাররক্ষীরা তো তাঁর কথায় হেসেই কুটিপাটি। লোকটার স্পর্ধা কত! যেন নিজের গচ্ছিত টাকা ফেরৎ চাইছে বাদশার কাছে। ফকিরকে বদ্ধ পাগল মনে করে একজন দ্বাররক্ষী রহস্য করে বলল;

'জনাব! আপনার আদেশ অবশ্যই বাদশার কাছে নিবেদন করব। তা আপনার ঠিকানাটা বলে যান। টাকাটা সেখানে পেঁাছে দিতে হবে তো?'

ফকির গম্ভীরভাবে নিজের ঠিকানা রেখে সে স্থান ত্যাগ করলেন। দ্বাররক্ষী অনেকক্ষণ তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল। লোকটাকে সে পাগল মনে করলেও কি জানি কেন তার আদেশ অমান্য করতে সাহস করল না। সে অন্যান্য দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত কথাটা খলিফার কানে তোলাই স্থির করল।

খলিফা হারুণ-অল-রশিদ দ্বাররক্ষীদের কথায় খুব আমোদ বোধ করলেন। দৈনন্দিন রাজকার্যের একঘেয়েমিতা কাটানোর এমন চমৎকার একটা উপকরণ হাতের কাছে পেয়ে তিনি তা নষ্ট করতে রাজী হলেন না। তাই লোক পাঠালেন ফকিরকে দরবারে ধরে নিয়ে আসার জন্য।

যথাসময়ে ফকির এসে হাজির হলেন খলিফার দরবারে।

খলিফা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে? আর কেনই বা আমাকে এক হাজার সোনার দীনার পাঠাতে বলেছিলে?'

ফকির উত্তর দিলেন, 'হজরৎ! আমি একজন ফকির। ফকিরী ছাড়া আমার আর কোনও রুজি রোজগার নেই। এইভাবে বেঁচে থাকা ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হওয়ায় আমি একদিন মনের দুঃখে খোদাকে জানালাম: "হে খোদা! খলিফা হারুণ অপরিমিত ঐশ্বর্য আর বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে পরম সুখে দিন কাটাচ্ছেন, আর আমি ফকির সেজে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছি। তোমার তৈরী জগতে এতবড় অসাম্য কেন? কেন তিনি তোমার

অনুগ্রহভাজন আর আমি তোমার চক্ষুশূল? আমিও তো প্রতিদিন নিয়মিত তোমার ভজনা করি। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের যা যা কর্তব্য তার সবই করি। তবে? এ নিশ্চয়ই তোমার একচোখামি।"

'শুনলে আশ্চর্য হবেন কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি একবর্ণও মিথ্যা বলছি না, সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী হলো ঃ "বৎস! তোমার সঙ্গে হারুণের তুলনা হতে পারে না। হারুণ আমার অনুগ্রহের পাত্র কেন সে বিষয়ে তোমার মনে ঈর্ষা জাগা ঠিক নয়। খলিফা হারুণ মহৎপ্রাণ মানুষ। পরম ধার্মিক। সত্য, ন্যায় ও দয়ার আধার। তিনি তোমার দুরবস্থার কথা টের পেলে নিশ্চয়ই বিশেষ ভাবে সাহায্য করবেন। তুমি যেদিন ইচ্ছা পরীক্ষা করে দেখতে



পার। কেন যে তিনি আজ বাদশার তখতে বসে পার্থিব সুখভোগ করছেন তার প্রমাণ পাবে।"

জাহাঁপনা ! খোদাতালার কথায় ভাবলাম; বেশ তো পরীক্ষা হয়ে যাক, কোনগুণে তিনি দুনিয়ার বাদশা আর আমি পথের ভিখারী। আপনি কেমন দাতা তা যাচাই করে দেখার জন্যই আজ সকালে প্রাসাদের দ্বাররক্ষীদের মারফতে এক হাজার সোনার দীনার প্রার্থনা জানিয়ে এসেছি আপনার কাছে।'

খলিফা হারুণ ফকিরের কথার চাতুরীতে খুবই মুগ্ধ হলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তায় পরম সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কার স্বরূপ এক হাজারের জায়গায় দু-হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দানের আদেশ দিলেন খাজাঞ্চীকে।

আশাতীত অর্থ পেয়ে ফকির তো মহা খুশী। তিনি তাঁর ডেরায় ফিরে ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে প্রথমেই বিরাট পান-ভোজনের আয়োজন করলেন। খুব হৈ-হুল্লোড় চলল কদিন ধরে। ফকির যদি মিতব্যয়ী হতেন—হিসেব করে খরচ করতেন—দিলদার আর হাতখোলা না হতেন তবে খলিফার দেওয়া অর্থে তাঁর বাকী জীবন বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে যেত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হলো না; বছর ফুরোতে না ফুরোতেই পুনরায় তাঁর ঘোর অর্থকষ্ট উপস্থিত হলো। ফকির তখন নতুন উপায় ভাবতে বসলেন।

ফকিরের সৌভাগ্যই বলতে হবে অচিরেই বিপুল অর্থ উপার্জনের চমৎকার একটি সুযোগ এসে হাজির হলো তাঁর সামনে।

মহামতি ইলাইজাকে দেখার সাধ অনেকদিন ধরেই ছিল খলিফা হারুণ-অল-রশিদের। কিন্তু ঠিকমত যোগাযোগ ঘটছিল না। তাই তিনি রাজ্যময় ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে - যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ভাববাদী মহামতি ইলাইজার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতে পারবে, তাকে তিনি আশাতীতভাবে পুরস্কৃত করবেন।

ফকির শেষ পর্যন্ত এই সুযোগটিকেই আঁকড়ে ধরলেন। একদিন তিনি দরবারে হাজির হয়ে খলিফাকে বললেন, 'খোদাবন্দ! আপনি যদি আমার আগামী তিন বছরের জন্য খাওয়া পরার সুবন্দোবস্ত করে দিতে রাজী থাকেন তবে আমি আপনার মনের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করে দিতে পারি। আমি এই তিন বছরের ভেতরেই মহামতি ইলাইজার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ঘটিতে দেব বলে শপথ করছি।'

রাজী হলেন খলিফা। তবে এক শর্তে। ফকির যদি এই তিন বছরের মধ্যে তাঁর কথা না রাখতে পারেন—অর্থাৎ মহামতি ইলাইজাকে না দেখাতে পারেন, তবে কারাগারে বাকি জীবন কাটিয়ে তাঁকে তাঁর কথা না রাখার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ফকির একটু থতমত খেয়ে গেলেন প্রথমে। পরে ভাবলেন; দীর্ঘ তিন বছরের ব্যাপার তো। রাজকার্যে নিরন্তর ব্যস্ত খলিফা হয়তো ভুলেও যেতে পারেন কথাটা। কিংবা মাফও করে দিতে পারেন পা ধরে তখন একটু কান্নাকাটি করলে। তাছাড়া মানুষেয় জীবন তো পদ্মপাতায় জলের ফোঁটার মত। কেউ বলতে পারে না মৃত্যুর কথা। এই তিন বছরের মধ্যে খলিফা ইহলীলা সংবরণ করতে পারেন অথবা তিনি নিজেও মারা যেতে পারেন। সুতরাং—এই ভেবে খলিফা হারুণের শর্তেই রাজী হয়ে গেলেন ফকির।

খলিফা হারুণ-অল-রশিদ ছিলেন বহুদর্শী মানুষ। তিনি খুব সহজেই আন্দাজ করে নিলেন ফকিরের মনের ভাব। তাই তাঁকে

দৃষ্টিছাড়া না করার মতলবে নিজের প্রাসাদের চৌহদ্দীর মধ্যেই তাঁর থাকার ও খাওয়ার সুচারু ব্যবস্থা করে দিলেন। ফকির একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেও কপাল ঠুকে রয়েই গেলেন খলিফার নজরে নজরে।

সময় আর নদী কারো সুখ অথবা দুঃখের জন্য অপেক্ষা করে থাকে না। তারা নিজেদের নিয়মেই বয়ে চলে। দেখতে দেখতে তিনটি বৎসর পার হলো। তখনও নিজের সাধ মিটল না দেখে খলিফা একদিন ফকিরকে দরবারে তলব করে বললেন, 'নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে ফকিরসাহেব, কিন্তু তুমি তোমার কথা রাখতে পারলে না। অতএব কারাবাসের জন্য প্রস্তুত হও।'

ফকির চুপ।

খলিফা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

একদিন কারারক্ষীদের কাজে গাফিলতির সুযোগ নিয়ে পালালেন ফকির। পালিয়ে গিয়ে এক কবরস্থানে ঢুকে পরিত্যক্ত এক কবরের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। কবরচোরেরা কবর খুলে মৃতদেহ চুরি করে নিয়ে যাওয়ায় কবরটি সেই থেকে খালিই পড়েছিল। ফকির জানতেন সে কথা এবং ঐ কবরে প্রবেশের কৌশলও তাঁর অজানা ছিল না। ফলে কবরে ঢুকে আত্মগোপন করার পক্ষে কোন অসুবিধেই হলো না তাঁর।

কয়েকদিন ভাল ভাবেই কাটল। খলিফার অনুচরেরা ফকিরের কোন সন্ধানই পেল না। এমন একটা স্থানে যে ফকির লুকোতে

পারেন এ তাদের ধারণাতেই এলো না। ফকির সঙ্গে করে যেটুকু খাদ্য আনতে পেরেছিলেন তাতেই কদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন। ক্রমে ক্রমে খাদ্যাভাব দেখা দিল। সেই সঙ্গে জল কষ্ট। এখন উপায় ? ধরা পড়ার আশংকায় কবর ছেড়ে বার হতে পারেন না ফকির। কোনও মতে লুকিয়ে চুরিয়ে গভীর রাতের দিকে বেরোতেন গুপ্তস্থান ছেড়ে, তারপর হাতের কাছাকাছি যা পেতেন—যতটুকু পেতেন, তাই নিয়ে এসে কবরের ভেতরে বসে বসে খেতেন। কিন্তু এভাবে কতদিন আর চলতে পারে ?

একদিন ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ফকির কবরের বাইরে বেরিয়ে এসে ভাবছেন, কী করা যায় ? এমন সময় হঠাৎই একজন শুভ্র বেশধারী সুন্দর আকৃতির যুবক যেন আশমান থেকে নেমে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ফকিরসাহেব ! আপনি এই নির্জন ও পরিত্যক্ত স্থানে কি করছেন ?'

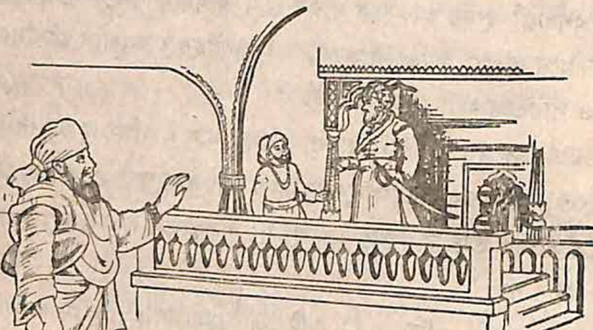
চমকে উঠলেন ফকির। ভয়ও পেলেন খুব। খলিফার চর নাকি ? কিন্তু যুবকের তেজোদৃপ্ত অথচ সরল সুন্দর মুখকান্তি দেখে সে সন্দেহ তাঁর মনে ঠাঁই পেল না বেশীক্ষণ। তবে জবাবও দিলেন না।

যুবক বলল, 'আপনার ভয় নেই, ফকিরসাহেব। আমি আপনার অনিষ্ট করতে এখানে আসিনি। মনে হচ্ছে আপনি কোন ভীষণ চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। যদি না আমায় বলতে আপত্তি থাকে তবে বলুন। আমিও চেষ্টা করে দেখি কোন সুরাহা করা যায় কিনা।'

যুবকের কণ্ঠস্বরে যে অভয় আর আশ্বাস ছিল তা ফকিরের অন্তর স্পর্শ করল। তিনি আর দ্বিধা না করে আদ্যোপান্ত সব খুলে

বললেন যুবককে।

ফকিরের কথার শেষে যুবক বলল, 'আপনি কিন্তু সত্যিই অন্যায় করেছেন, ফকিরসাহেব। রাজা ঈশ্বরের প্রতিভু বলেই দেশে দেশান্তরে স্বীকৃত এবং পূজিত। তিনি ঈশ্বর মনোনীত। আপনি তাঁর সঙ্গেই প্রতারণার খেলা খেলেছেন? একবার নয় দু-দুবার। এ অপরাধের ক্ষমা নেই—ক্ষমা হয় না। তবে আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আপনার কোন অনিষ্ট করব না। আপনি বরং আমার সঙ্গে খলিফার দরবারে চলুন। আপনার হয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব বাদশার কাছে। আসুন। তিনি আমার অনুরোধ কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।'



যুবকের সঙ্গে ফকির হাজির হলেন খলিফা হারুণের দরবারে।

যুবক বাদশাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'মহামান্য খলিফা! এই ফকির সাহেব আপনার সঙ্গে প্রতারণা করে এবং সুযোগ বুঝে কারাগার থেকে পালিয়ে ছিলেন। আমি ওঁকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছি। এবার আপনার যা করা ভাল বিবেচনা হয় তাই করুন।'

যুবকের কথাবার্তায় ফকির তো মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। হায়, সুন্দর মুখ দেখে বিশ্বাস করে কী ভুলই না তিনি করেছেন। লোকটার মনে যে কালসাপ লুকিয়ে ছিল তা তার বাহ্যিক আচরণে একটুও বুঝতে পারা যায় নি। মনে মনেই নিজের কপাল চাপড়াতে লাগলেন ফকিরসাহেব।

খলিফা হারুণ যে সিংহাসনে আসীন ছিলেন তার একটি পায়া ছিল ছোট। তলায় ঠেকনা দেওয়া ছিল। তিনি তা জানতেন না। ফকিরকে দেখেই তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন। তাঁকে নিজের হাতে শাস্তি দেবার জন্য যেই ধড়ফড় করে উঠতে গেছেন সিংহাসন ছেড়ে অমনি সিংহাসনটা নড়ে গেল। আর তিনিও ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাই দেখে যুবক হেসে বলল, 'য্যায়সা কা ত্যায়সা।'

বাদশাকে সিংহাসন উল্টে পড়ে যেতে দেখে তাঁর একজন দেহরক্ষী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে হাত ধরে তাঁকে তোলবার চেষ্টা করল। রক্ষীটি আবেগের বশে এত শক্ত করে খলিফার হাত চেপে ধরেছিল যে তিনি ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন। তাই দেখে যুবক আবার হেসে বলল, 'য্যায়সা কা ত্যায়সা।'

অতঃপর খলিফা হারুণ উঠে দাঁড়ালেন মাটি ছেড়ে। তাঁর সিংহাসন পাল্টে দেওয়া হলো। তিনি নতুন সিংহাসনে বসে বিচার শুরু করলেন। উজীর জাফর এবং অন্যান্য উজীরদের জিজ্ঞাসা করলেন, ফকিরের অপরাধের জন্য তাকে কী শাস্তি দেওয়া যায়। প্রথম সহকারী উজীর একটুও ইতস্ততঃ না করে জবাব দিলেন, 'জাহাঁপনা! এই প্রতারক ফকিরের দেহ খণ্ড খণ্ড করে লোহার শিকে বিঁধিয়ে জনসমক্ষে ঝুলিয়ে রাখা উচিত—লোকে জানুক

খোদ খলিফার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করার পরিণাম কি।'

যুবক তেমনই হাসিমুখে বলল, 'উজীর সাহেব ঠিকই বলেছেন। য্যায়সা কা ত্যায়সা।'

দ্বিতীয় উজীর বললেন, 'জাহাঁপনা! আমার মতে এই লোকটিকে গরম জলে সিদ্ধ করে পরে সেই সিদ্ধ মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে লোকসমক্ষে কুকুরকে খাওয়ানো উচিত।'

এই কথা শুনে যুবক অগের মতই হেসে বলল, 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। য্যায়সা কা ত্যায়সা।'

কিন্তু প্রধান উজীর জাফর অন্য মত প্রকাশ করলেন, 'খোদাবন্দ! আমার বিবেচনায় ফকিরসাহেবকে এবারের মত শুধু সতর্ক করেই ছেড়ে দিন। আমি জানি উনি স্বভাব অপরাধী নন।



অভাবে অথবা দায়ে পড়ে যা অসম্ভব তা সম্ভব করতে চেয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে এই অপরাধ করে ফেলেছেন। উনি বুদ্ধিমান লোক; আশা করি নিজের অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত। সুতরাং ওঁকে এ যাত্রায় ক্ষমা করাই উচিত।'

যুবক সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করল ঃ 'উজীর জাফর যথার্থই বলেছেন। য্যায়সা কা ত্যায়সা।'

খলিফা হারুণ-অল-রশিদ তিন উজীরের রায় দানের ওপর যুবকটির একই মন্তব্য তিনবার শুনে সবিস্ময়ে তার তাৎপর্য জানতে চাইলেন। যুবক বলল, 'শুনুন ধর্মাবতার। "য্যায়সা কা ত্যায়সা" বলার অর্থ—প্রত্যেক বস্তুই তার মূল পদার্থের অনুরূপ। যে কারিগর আপনার ঐ সিংহাসনটি প্রস্তুত করেছিল সে নিশ্চয়ই ছিল খোঁড়া। তাই আপনার সিংহাসন করতে গিয়ে সে অবচেতন ভাবেই মাপ-জোখ ভুল করে তার একটি পায়া ছোট করে ফেলে।

'আপনার যে পার্শ্বরক্ষীটি আপনার হাত সবলে চেপে ধরে আপনাকে ওঠাতে চেষ্টা করছিল জাতিতে সে দিনমজুর। সবলে কোদাল চেপে ধরে মাটি কাটাই ছিল তার বংশগত কাজ। তাই বংশের ধারা অনুযায়ী অবচেতন ভাবেই সে সজোরে আপনার হাত চেপে ধরেছিল।

'প্রথম উজীর নিয়ামতের বংশ পর্যালোচনা করলে দেখবেন তিনি কসাইয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই অপরাধীর শাস্তি বিধান করতে গিয়ে বলেছেন ফকিরসাহেবের দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে লোহার শিকে গেঁথে জনসমক্ষে ঝুলিয়ে দিতে।

দ্বিতীয় উজীর হাসমত-এর কথা থেকেই বোঝা যায়, তিনি বাবুর্চি বংশজাত। তাই কড়াই করে গরম জলে সিদ্ধ করার উদাহরণ তাঁর আগে মনে হয়েছে।

'আপনার প্রধান উজীর জাফর সৎ ও সম্ভ্রান্ত বংশজাত। তাই তাঁর কথায় বংশের ধারা অনুযায়ী শাস্তির বদলে ফকিরকে ক্ষমা করার

আদেশই ফুটে উঠেছে। আমি তাই প্রতি ক্ষেত্রেই বলেছিলাম ঃ "য্যায়সা তা ত্যায়সা।"

খলিফা হারুণ যুবকের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর তিন উজীরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে তাঁরা অবনত মস্তকে যুবকের কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলেন। বাদশা তখন পরিপূর্ণ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আগন্তুক যুবককে জিজ্ঞসা করলেন, 'আপনি কে জনাব ?'

যুবক মৃদু হেসে জবাব দিল, 'যাকে একটিবার চাক্ষুষ করার জন্য আপনি দীর্ঘদিন ধরে উৎসুক হয়ে ছিলেন, এই ফকিরসাহেব



যাকে দেখাবার জন্য আপনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন—আমিই সেই ভাববাদী ইলাইজা। মহামহিম ঈশ্বরের এক দীনহীন নফর। আপনার সাধ মিটেছে তো ? এবার ব্যাচারা ফকিরসাহেবের কসুর মাফ করে ওঁকে মুক্তি দিন। আমি ওঁকে অভয় দিয়েছিলাম।' বলেই তিনি সভা থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

এর পরের ঘটনা খুব সরল আর সংক্ষিপ্ত। খলিফা হারুণ-অল-রশিদ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুণেই এবং মহামতি ইলাইজার অনুরোধে

ফকিরের সব অপরাধ মার্জনা করলেন। কেবল তাই নয় আর যাতে না তাঁকে অভাবের দায়ে গর্হিত কাজ করতে হয় তারও বন্দোবস্ত করে দিলেন। অর্থাৎ ফকিরের বাকি জীবনে অন্ন-বস্ত্র ও অর্থের সমস্যা আর রইল না।

সুলতান ও তাঁর উজীরের গল্প

পূর্বকালে তুরস্কের পশ্চিম দিকে সিরিয়া দেশে কুতবুদ্দিন নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান রাজত্ব করতেন। তাঁর প্রধান উজীরের নাম বারবাক। তিনিও ছিলেন তাঁর প্রভুর মতই নানা সদগুণে ভূষিত। উজীর বারবাক বিবাহ করেছিলেন হিন্দুস্হানের কাশ্মীর রাজ্যের জনৈক সুন্দরী রমণীকে। তাঁদের একটি কন্যাসন্তান জন্ম লাভ করেছিল। মেয়েটির রূপের কোনও তুলনা ছিল না। উজীর তাই আদর করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন—গুলবদন।

মেয়েটি যত বড় হতে লাগল তার রূপও তত বাড়তে লাগল। ক্রমে ক্রমে সে কথা সুলতানের কানে উঠল। তিনি কৌতূহলী হয়ে তাঁর রাজ্যের এই শ্রেষ্ঠা সুন্দরীটিকে দেখার জন্য একদিন উজীরের প্রাসাদে গিয়ে উপস্হিত হলেন। গুলবদনকে দেখে তিনি এমনই মোহিত হলেন যে; উজীরকে অনুরোধ করলেন তাঁর কন্যাকে রাজ

প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে রাখতে। সময় এলে তিনি তাঁকে নিজের বেগম করবেন। উজীর আর কি করেন। সুলতানের অনুরোধ তো আদেশেরই নামান্তর। তিনি তাঁর বেতনভুক অধীন কর্মচারী মাত্র। সুতরাং এ আদেশ অবহেলা করার শক্তি বা সাহস কোনটাই তাঁর নেই। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কন্যাকে রাজ-অবরোধে পাঠাতে হলো তাঁকে। গুলবদন রাজপ্রাসাদে নীত হলো।

দেখতে দেখতে যৌবনে পদার্পণ করল গুলবদন। শরীরের কানায় কানায় রূপ, কানায় কানায় যৌবন। সুলতান কুতবুদ্দিন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। এমন সুন্দরী বিদুষী আর নৃত্যগীত পটিয়সী বেগম কখনো সুলতানের হারেমে আর একটিও ছিল না। আর গুলবদনেরও গর্ব ছিল যে, এত বড় এক রাজ্যের পরাক্রান্ত অধীশ্বর তার হাতের মুঠোয়।

একদিন হঠাৎই এক ঘটনা ঘটল।

সুলতান কুতবুদ্দিনের কি খেয়াল হল সেদিন, স্থির করলেন শাদীর আগে তাঁর দরবারের বিশিষ্ট দরবারীদের নিয়ে তিনি একটা পান-ভোজের আয়োজন করবেন। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। বিরাট আর বিপুল ব্যবস্থা হলো প্রাসাদের উদ্যানে। প্রথম প্রথম উচ্চ ও নিম্ন পদাধিকারীদের মধ্যে যথাযোগ্য ব্যবধান ছিল। কিন্তু পানীয়ের মাত্রা যত চড়তে লাগল সেই ব্যবধান ততই হ্রাস পেতে লাগল। নিজের নিজের পদের গৌরব, গাম্ভীর্য আর মর্যাদা ভুলে গিয়ে সুরার নেশায় যার যা খুশি আবোলতাবোল বকতে

লাগলোন কিংবা এলোমেলো কাণ্ড করতে লাগলেন। সময় সময় এইসব মাতালদের সামলাতে গিয়ে প্রাসাদের নফর বা রক্ষীরা তো রীতিমত হিমসিম খেয়ে গেল। অন্যের কথা কি স্বয়ং সুলতানই মদের প্রভাবে বেএক্তিয়ার হয়ে পড়লেন। প্রিয়তমা গুলবদনের চিন্তায় তিনি হঠাৎ বড় বেশী রকম চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একই সঙ্গে তাঁর মনে গুলবদনের গুণাবলী ও চরিত্র সম্পর্কে অনুরাগ আর বিরাগ যুগপৎ জেগে উঠে নিজেদের মধ্যে তুমুল বিসম্বাদ বাধিয়ে দিল। স্থান কাল আর পরিবেশ মাহাত্ম্যে বিশেষ করে উগ্র সুরার প্রভাবে, কে জানে কেন সুলতানের মনে বিরাগের জয়পতাকা উড়ল পৎ পৎ করে। তাঁর ধারণা হলো, গুলবদন তাঁকে ভালবাসে-না। যেটুকু করে সেটুকু অভিনয় মাত্র করে। আসলে সে তাঁর ঐশ্বর্যের প্রতি অনুরাগিনী। একথা ভাবতে ভাবতেই সুলতান কুতবুদ্দিনের মগজে এসে শয়তান ভর করল। তিনি সহসা আসন ছেড়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে জড়িত কণ্ঠে আদেশ করলেন: 'এই, কে আছিস! এক্ষুণি হারেমে গিয়ে উজীরজাদী গুলবদনের মুণ্ডু কেটে নিয়ে আয়। আমার হুকুম! যে না যাবি তার মুণ্ডু আমি কাটব।'

বান্দা-বাঁদী-রক্ষী—যে যেখানে ছিল সেই সভায়, সবাই ত হতভম্ব, বিমূঢ়। এ আবার কী আজব আদেশ সুলতানের। তারা ঠিক শুনেছে তো। না কি এ মাতালের মাতলামি। কিন্তু আবার সেই হুকুম জারী হতেই তারা অস্থির হয়ে উঠল। এমন সাংঘাতিক মর্মঘাতি আদেশ কোন প্রাণে পালন করবে তারা? কে যে কী করবে ভেবে পেল না কেউ। গেলেও বিপদ। কাল সকালেই যখন সুলতানের নেশা কেটে যাবে, যখন খোঁজ করবেন প্রিয়তমার,

তখন ? তখন কি বুঝতে চাইবেন রাতের কথা ? আবার না গেলেও বিপদ। এখনি এক একজনের গর্দান নেবেন। তাছাড়া



যাকে এক পলক চোখের আড়াল করতে চান না সুলতান; হঠাৎ তার সম্পর্কে এমন অভাবিত কঠোর আদেশ—

শেষ পর্যন্ত একজন দুঃসাহসী বান্দা এই দুরূহ আর নিষ্ঠুর কাজের ভার নিতে এগিয়ে এল।

রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত। একমাত্র এই রাজোদ্যান ছাড়া বাকী জগৎ নিস্তব্ধ। সুলতানের হারেমও সুষুপ্তির কোলে ডুবে আছে। রক্ষী-রক্ষিণীরাও নিদ্রিত। নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘাতক এসে হাজির হলো গুলবদনের শয়নকক্ষে।

শয্যায় শায়িতা রূপসী রমণীর নিদ্রিত রূপমাধুরী দেখে ঘাতকও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। মনে মনে সুলতানকে শত ধিক্কার দিল। নিজেকে ধিক্কৃত করল সহস্রবার। কিন্তু সে নিরুপায়। এ কাজ না করলে অনেকগুলি নিরীহ লোকের প্রাণ অকারণে চলে যাবে সুলতানের জিঘাংসার কবলে। কাজে কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে এই অপ্রীতিকর কাজ করতেই হলো। ঘাতক গুলবদনকে ঘুমন্ত অবস্থায় নিহত করে তার ছিন্ন মুণ্ড এনে দিল সুলতানকে। তিনি ঘাতককে বাহবা দিয়ে বললেন, 'সাবাস! কাল সকালে তোকে আমি দরবারে সকলের সামনে হাজার আসরফি পুরস্কার দেব।'

পরদিন সকালে যা আশংকা করা গেছিল ঠিক তাই ঘটল। সুলতান নেশামুক্ত হয়ে প্রথমেই তাঁর বেগমের খোঁজ নিলেন। এই সর্বনাশা খবর এখন কে তাঁকে দেবে—এই নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল বান্দা-বাঁদীরা। অবশেষে এক বৃদ্ধ বান্দা নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে গত রাত্রের ঘটনাবলী জ্ঞাপন করল সুলতানকে। পরিশেষে

এও জানাল, সুলতানেরই আদেশে সেই ছিন্নমুণ্ড আর মুণ্ডহীন দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই সর্বনাশা খবর শুনে সুলতান তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তাঁর যেন আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা রইল না। তিনি চতুর্দিকে শূন্য আর অন্ধকার দেখতে লাগলেন। নিজের পানাসক্তির জন্য নিজেকে অসংখ্যবার ধিক্কার দিলেন। সুলতান ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে আর কখনো সুরা স্পর্শ করবেন না।

সময় কারো অনুরোধ রাখে না। সে আপনার মনে ঠিকই অবিরাম বয়ে চলে। ক্রমে ক্রমে দু'মাস কেটে গেল। এই দুই মাসের মধ্যে জগৎশুদ্ধ লোকের মধ্যে কত কি পরিবর্তন ঘটল কিন্তু সুলতান কুতবুদ্দিনের মনোভাবের বিন্দুমাত্র লাঘব হলো না। সর্বদাই গুলবদনের জন্য আক্ষেপ করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সৌম্যকান্তি আগের চেয়ে অনেক মলিন হয়েছে—দেহ হয়েছে শীর্ণ—মন হয়েছে বিষণ্ন নিরানন্দ।

উজীর বারবাক প্রভুর এহেনঅবস্থা দেখে তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছেন। এও বলেছেন যে, তিনি গুলবদনের পিতা হয়েও যখন কন্যার বিচ্ছেদ ধীরে ধীরে সহ্য করে নিতে পেরেছেন তখন সুলতান কেন ভুলতে পারছেন না?

কিন্তু সব বৃথা। সুলতান যেন দিন দিন আরও ম্রিয়মান হতে লাগলেন।

উজীর দেখলেন, অবস্থা যদি এই গতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে তবে রাজ্যের পক্ষে অমঙ্গলকর। প্রজাদের পক্ষে অমঙ্গলকর। সুলতানের নিজের পক্ষে অমঙ্গলকর। তিনি তাই একদিন নিরুপায়

হয়ে বললেন, 'মালিক, আপনি যদি হঠাৎ আপনার হারানো প্রিয় বস্তুটিকে ফিরে পান তবে কী করবেন ?'

সুলতান বললেন, 'উজীর সাহেব ! কেন আর জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালছেন ? তাকে ফিরে পেলে প্রথমেই তার কাছে নিজের হঠকারিতার জন্য মাফ চেয়ে নেব। তারপর মোল্লা আর কাজীকে



ডেকে সাদী করে তাকে প্রধানা বেগমের মর্যাদা দেব। আর তার পুত্র-সন্তান জন্মালে তাকেই এই সুলতানী তখতের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্বাচন করব, এই আমার কসম।'

উজীর তখন মৃদু হেসে হাততালি দিতেই দরবারের এককোণ থেকে

একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সুলতানের সন্নিধানে। তারপর অবগুণ্ঠন—উন্মোচন করতেই আনন্দে আর বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। 'একি, গুলবদন তুমি! তুমি—তুমি তবে বেঁচে আছ!'

—'হ্যাঁ সুলতান, আমি বেঁচেই আছি।'

সুলতান বিস্ময়ে এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর মনে হলো তিনি বুঝি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছেন। সম্মুখস্থ এই নারী রক্তমাংসের মানবী তো? নাকি অলীক কোন মায়া—ছায়া মাত্র। তিনি হাত বাড়িয়ে গুলবদনকে স্পর্শ করলেন। তাঁর ভ্রান্তি দূর হলো। এত আনন্দ দুর্বল শরীর হঠাৎ সহ্য করতে পারল না। সুলতান সিংহাসনের ওপরেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। হৈ-চৈ উঠল দরবারে।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন সুলতান, দেখলেন তিনি নিজের শয়নকক্ষেই শুয়ে রয়েছেন সুকোমল শয্যায়। উজীর আর গুলবদন তাঁকে বিধিমত সেবা যত্ন করছে। সুলতান উঠে বসলেন। তারপর উজীরকে এই ঘটনার রহস্য উন্মোচন করতে অনুরোধ করলেন।

উজীর তখন বিনম্র বচনে জানালেন, 'হজরৎ! আপনি যখন সুরার প্রভাবে হতচেতন হয়ে আমার কন্যার ছিন্নমুণ্ড আনতে হুকুম জারি করলেন, আমি তখন আপনার কাছেই ছিলাম এবং এই সর্বনাশা হুকুম শুনে কেঁপে উঠলাম। জানি, আদেশ অমান্য করার শক্তি কারো নেই। এই নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালিত হবেই। আমি তাই উপায়ন্তর না দেখে ঘাতককেই হস্তগত করলাম। ইতিপূর্বে কোনও ব্যাপারে আমার সহায়তায় বিপদমুক্ত হয়ে ঐ

ঘাতকটি আমার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল। আমি এবার সেই উপকারের প্রতিদান চাইলাম তার কাছে। ধরা পড়লে বিপদ আছে জেনেও সে প্রতিদান দিতে রাজী হলো আমায়। এবং আমারই পরামর্শমত গুলবদনের বদলে বন্দীশালা থেকে জনৈকা দুঃশীলা বন্দিনী রমণীর মস্তক ছেদন করে আপনাকে দেখান হলো ও জানান হলো যে, আপনার হুকুম মতই কাজ করা হয়েছে। এই ভাবেই আমার কন্যার জীবনরক্ষা হলো। আমার এই গুস্তাখির জন্য আমি আমার ও সেই ঘাতকের অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করছি জাহাঁপনা।'

সুলতান উজীরের কার্যের সবিশেষ প্রশংসাই করলেন এই কথা শুনে। ঘাতককেও মার্জনা করলেন। তারপর প্রতিজ্ঞামত গুলবদনকেই প্রধানা বেগমের মর্যাদা দিয়ে, কয়েক বৎসর সুখ-সম্ভোগে কাটালেন। গুলবদনের পুত্রকেই রাজ্যের ভাবী সুলতান রূপে নির্বাচিত করে একদিন ইহলোক ত্যাগ করলেন সুলতান কুতবুদ্দিন।

উজীরের বুদ্ধির জোরেই সেদিন সবদিক রক্ষা পেয়েছিল।

আউজি ইবানা ও মুসার কাহিনী

পুরাকালে আয়াদরাজ্যে আউজি ইবানা নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি রাজত্ব করতেন। তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতি দুই ছিল দানবের মত। তাঁর নামে সাধারণের হৃদকম্প উপস্থিত হতো।
মুসা ছিলেন ইহুদী জাতির সর্বজনমান্য নেতা। একদিন তিনি ইহুদী ধর্মের প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে দশ হাজার রণকুশলী সাহসী সৈনিক নিয়ে আয়াদরাজ্যের প্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। কারণ ইবানা আর তাঁর প্রজারা ছিলেন ম্লেচ্ছ ধর্মাবলম্বী।
ইবানা সসৈন্যে মুসাকে রাজ্যের উপান্তে উপস্থিত হতে দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন এবং তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য নিজের সৈন্যদের প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। এবং সদম্ভে অগ্রসর হয়ে মুসার ইস্রায়েলী সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি শিবির স্থাপন করলেন।

ইবানার বিকট দৈত্যাকৃতি চেহারা। তাঁর মেঘগর্জনবৎ রণহুংকার আর বিপুল সৈন্যসমাবেশ দেখে ইস্রায়েলীরা ভয় পেয়ে গেল।



অনেকেই দল ছেড়ে পালাতেও শুরু করল জয়ের আশা নেই দেখে। স্বয়ং মুসাও যে ইবানাকে দেখে আর তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী অবলোকন করে ভয় পাননি তা নয়, কিন্তু রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অযুক্তিকর ও কাপুরুষোচিত কাজ হবে ভেবে

তিনি যুদ্ধ স্থগিত রেখে ইবানার সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হওয়াই ন্যায়সঙ্গত মনে করলেন এবং সে কারণে বারোজন সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ব্যক্তিকে ইবানার শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন ।

দ্বাদশ পণ্ডিত ইবানার শিবিরে গিয়ে তাঁর বিভীষণ মূর্তি দেখে আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলেন; সন্ধির আলোচনা করবেন কি ? আতংকে কারো মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না । একটি আঙুল পর্যন্ত নড়ল না ।

রাজা আউজি ইবানা তখন নিজের আসনে বসে একটি তীক্ষ্মধার কুঠার দিয়ে নিজের নখ কাটছিলেন । খানিক্ষণ পরে হঠাৎ মাথা তুলে দেখলেন তাঁর শিবিরে ছোট ছোট পুতুলের মত বারোটি মানুষ ঢুকে করজোড়ে নিস্পন্দ ও নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে । তাঁদের দেখে অট্টহাস্য করে উঠলেন ইবানা । সেই হাসির আওয়াজে



সমস্ত শিবির থর থর করে কেঁপে উঠল । বারোজন পণ্ডিতের কানে তালা লেগে গেল । তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞান হারাবার উপক্রম করলেন । রাজা মনে মনে ভাবলেন; এদের তিনি নিজের প্রাসাদে নিয়ে যাবেন আর সন্তানদের খেলতে দেবেন জীবন্ত পুতুল

হিসেবে। এদের এখানে রেখে গেলে পালাতে পারে—এই বিবেচনা করে রাজা ইবানা সেই বারো পণ্ডিতকে নিজের অঙ্গবস্ত্রের মধ্যে রেখে রণক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

ইস্রায়েলী সৈন্যেরা সাক্ষাৎ কালান্তক যমসদৃশ দৈত্যাকার ইবানাকে চাক্ষুস করে আর তাঁর হাতের শাণিত কুঠারের ঘন ঘন আস্ফালন দেখে মুহুর্মুহু রণহুঙ্কার শুনে ভয়েই আধমরা হয়ে পড়ল। যুদ্ধ করবে কি! অধিকাংশ সৈন্যই পালাতে শুরু করল। যারা পালাল না, তারা দু-হাতে মুখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল



মাটিতে। তাদের নড়বার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত অন্তর্হিত হলো শরীর থেকে।

তখনকার দিনে সৈন্যদের অনেকের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরাও যেত রণস্থলে। তাদের কাজ ছিল আহতদের সেবা করা এবং শিবিরের পাচকদের রন্ধনে সহায়তা করা। সময় বিশেষে নৃত্য-গীত পরিবেশন করে সকলের মনোরঞ্জন করা।

এই রমণীবৃন্দ নিজের নিজের স্বামীর আর তাবৎ সৈন্যদের এহেন কাপুরুষতা দর্শন করে—বিশেষ করে তাদের এভাবে একা আর অসহায় অবস্থায় সাক্ষাৎ যমের মুখে ফেলে রেখে পালাতে দেখে, মর্মান্তিক রোষে আর ক্ষোভে চিৎকার করে ভৎর্সনা করতে আর ধিক্কার দিতে লাগল। তারা সবাই মিলে মুসার শরণাপন্ন হয়ে কাতর কণ্ঠে আবেদন জানাল: 'প্রভু! এখন আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।'

ঐ মুষিককুলের মধ্যে মুসাই ছিলেন একমাত্র সাহসী সিংহ। একমাত্র তিনিই ছিলেন অবিচলিত এবং অকম্পিত। তিনি রোরুদ্যমানা রমণীবৃন্দকে আশ্বাস দিয়ে শিবিরে পাঠিয়ে একাকী অকুতোভয়ে ইবানার সঙ্গে সংগ্রামে অগ্রসর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে ইবানাকে সম্বোধন করে বললেন, 'রাজন! আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি সঙ্গীবিহীন, একাকী। এ অবস্থায় আমাকে সসৈন্যে বেষ্টন করে ফেলে বিনষ্ট করে ফেলা আপনার পক্ষে এক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু সেটা মোটেও গর্ব কিংবা গৌরবের কাজ নয়। একের বিরুদ্ধে বহু। এতে সাহস বা বীরত্বের বড়াই কোথায়? ন্যায়সঙ্গত এবং বীরোচিত কাজ হবে তখনই যখন আপনি আমার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আমাকে পরাজিত করতে পারবেন। রাজা ইবানা, এই আমি আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান রয়েছি। যদি প্রকৃতই রাজকূলজাত হয়ে থাকেন তবে

একাকী আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন।'

মুসার স্পর্ধায় ইবানা প্রথমে ভারী অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর অহমিকায় ঘা লাগল। পরক্ষণেই রাগে জ্বলে উঠলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ নিজের দলের সৈন্যদের নিরস্ত থাকতে আদেশ দিলেন। শুরু হলো দুই মহাবীরের প্রচণ্ড সংগ্রাম।

প্রাণপণে এবং অসীম বীরত্বের সঙ্গে ইবানাকে আক্রমণ করলেন মুসা কিন্তু তাঁর সব আক্রমণই অবলীলাক্রমে ব্যর্থ করে দিয়ে ইবানা এক প্রকাণ্ড গদা উত্তোলন করে মুসাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। সেই ভীষণ গদা মুসার দেহের কোনও স্থানে লাগলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতেন সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু রক্ষা করলেন পরম করুণাময় ঈশ্বর।

তিনি প্রিয়তম পাত্রের এই ঘোর বিপদ দেখে তাঁর প্রধান দূত জিব্রাইলকে মুসার উদ্ধারের জন্য পাঠালেন। জিব্রাইল এক বিরাট পাখীর চেহারা ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে, চোখের পলকে ইবানার হাতের গদাটি ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন এবং ঠোঁট দিয়ে নিজের দেহের একটি পালক খসিয়ে সেটি ফেলে দিলেন মুসার শরীরে।

আয়াদরাজ ইবানা তো ঘটনা দেখে স্তম্ভিত! তাঁর বিস্ময় আরো বহুগুণে বেড়ে গেল যখন দেখলেন, সেই দৈবী পাখীর পালকের ছোঁয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী মুসার কলেবর বাড়তে বাড়তে তাঁর সমান সমান হলো। আর তাঁর অস্ত্রশস্ত্রের আকারও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেল।

দৈবী পালকের স্পর্শে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে মুসার শরীরে যেন হাজার হাতীর শক্তি ও সামর্থ এসে ভর করল। তিনি নিজের হাতের গদা উত্তোলন করে তা দিয়ে এমন জোরে ইবানাকে আঘাত করলেন যে, ঐ এক আঘাতেই ইবানা রক্তবমি করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এই অসম্ভব আর অলৌকিক ব্যাপার দেখে আয়াদরাজের সৈন্যরা রণক্ষেত্রে আর অপেক্ষা না করে প্রাণভয়ে পালাতে লাগল।

ইবানাকে ভূপতিত হতে এবং মারা যেতে দেখে যে সমস্ত ইস্রায়েলী সৈন্য পালিয়ে গিয়ে দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে এই অসম যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করছিল—তারা এবার ফিরে এলো



উল্লাস করতে করতে। এসেই সদর্পে বলল, 'প্রভু! আদেশ করুন, পশ্চাদধাবন করে ওদের সমূলে বিনষ্ট করি।'

মুসা তাদের কথায় ভীষণ রেগে গিয়ে উত্তর করলেন, 'ওরে ভীরু কাপুরুষ মূষিকের দল! আমার চোখের সামনে থেকে এই মুহূর্তে দূর হয়ে যা সবাই। তোদের মুখ দেখাও মহাপাপ। কী আশ্চর্য! তোদের চেয়ে তোদের স্ত্রীরা অধিকতর সাহসী। তাদের দেখেও তোদের লজ্জা হচ্ছে না? তোদের মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করছে না? তোদের জীবনে শত-সহস্র ধিক্! তোদের জন্মে শত-সহস্র ধিক্। আমি ঈশ্বরের নির্দেশে এই অভিশাপ দিচ্ছি—আজ থেকে তোদের জীবনের সব রকম উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যাক। আজ থেকে আগামী এক সহস্র বৎসর ধরে তোরা পথে পথে, দেশে দেশে, গৃহহারা হয়ে ঘুরবি। কেউ তোদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না।' এই বলে মুসা রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

মুসার অভিশাপের পর থেকেই ইহুদী জাতি দেশহীন হয়ে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ ও হাসানের কাহিনী

দামাস্কাস নগরীর প্রান্ত ভাগে মনজুর নামে এক মধ্যবিত্ত ব্যক্তি বাস করতেন। একমাত্র পুত্র হাসান ছাড়া তাঁর আর কেউ ছিল না।

হাসানকে দেখতে ছিল সুন্দর, তার ব্যবহার ছিল মিষ্টি, আর সে চমৎকার গান গাইতে পারত।

মনজুরের একটি দোকান ছিল, আগে তিনিই দেখাশোনা করতেন ; এখন হাসান বড় হবার পর তার ওপরেই দোকান চালাবার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। সত্যি কথা বলতে কি, হাসান দোকানের ভার নেবার পর দোকানের আয় অনেক গুণ বেড়ে গেছিল আগের চেয়ে। এর প্রধান কারণ অবশ্যই হাসানের মিষ্টি ব্যবহার আর তার মধুর কণ্ঠের গান।

একদিন তার দোকানে এক সম্ভ্রান্ত দর্শন আগন্তুক এলেন। আগন্তুক বিদেশী। হিন্দু ব্রাহ্মণ। নাম পদ্মনাভ।

হাসান তখন ক্রেতা-সাধারণের অনুরোধে তাদের গান শোনাচ্ছিল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে পদ্মনাভও সে গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তারপর ভীড় সরে গেল হাসানের দোকানে এসে তার সঙ্গে আলাপ করে, তার সুন্দর চেহারা দেখে তাকে আরো ভাল লেগে গেল তাঁর। যাবার সময়ে তিনি সামান্য কিছু জিনিস কিনে দাম হিসেবে এক স্বর্ণ দীনার দিয়ে গেলেন। হাসান বাকী পয়সা ফেরৎ দিতে গেলে তিনি নিলেন না। বললেন, বাকী পয়সা তাঁর তরফে গায়ক হাসানকে পুরস্কার।

এরপর প্রায় প্রতিদিনই পদ্মনাভ আসতেন ঐ দোকানে। হাসানের গান শুনতেন, একটু গল্পগুজব করতেন তারপর সামান্য কিছু সওদা করে একটা করে সোনার দীনার তার হাতে দিয়ে যেতেন—বাকি পয়সা কখনও নিতেন না।

হাসান একদিন তার বাবার কাছে এই ঘটনা গল্প করল।

হাসানের বাবা বললেন, 'বৎস! তুমি ছেলেমানুষ। এখনও তুমি দুনিয়াদারীর বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞতা লাভ করনি। মানুষের চরিত্র যে কী অদ্ভুত, তার জ্ঞান এখনও তোমার হয়নি। এই শহরে কোন লোক যে কী মতলবে ঘোরাফেরা করছে তা জানা কঠিন। হিন্দুটির এই আচরণ আমার মোটেও ভাল ঠেকছে না। যা হোক, লোকটি এবার এলে তাকে আমার সেলাম জানিয়ে আমার

তরফ থেকে বাড়ীতে আসার দাওয়াৎ দিও। একবার তার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হলে বুঝতে পারা যাবে, তার আসল উদ্দেশ্য কী।'

পরের দিন পদ্মনাভ দোকানে এলে হাসান তাঁকে এক ফাঁকে পিতার ইচ্ছা নিবেদন করল। তিনি হাসানের পিতা মনজুরের সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলেন না। যেতে রাজী হলেন। আলাপ পরিচয় হলো দুজনের মধ্যে।

মনজুর বুঝলেন, তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণটির সম্পর্কে যা ধারণা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ব্রাহ্মণ প্রকৃতই গুণের সমঝদার, পরহিতব্রতী এবং সদাশয়। তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এতদূর মোহিত হলেন যে, তাঁকে সেখানে দুদিন আতিথ্য নিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। পদ্মনাভ এবারেও তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না।

ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ মুসলমান মনজুরের বাড়ীতে বেশ আরামেই রয়েছেন। নিজে তিনি উদারপন্থী, মনজুরও তাই। ফলে কোন তরফে কোন অসুবিধাই ছিল না। উপরন্তু হাসানকে তিনি ঠিক নিজের পুত্রবৎ স্নেহ করতে শুরু করলেন। একদিন তিনি

তাকে ডেকে বললেন, 'হাসান! আমি তোমার নানান গুণে একান্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এত গুণের একত্র সমাবেশ সহজে নজরে পড়ে না। একমাত্র রাজা-বাদশারাই এর অধিকারী হন। যা হোক, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে একটি গুপ্তবিদ্যা শেখাব ভেবেছি। এই গুপ্তবিদ্যার বলে তুমি অনায়াসেই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারবে। যদি তোমার এই বিদ্যা শেখবার আগ্রহ ও ইচ্ছা থাকে তবে আজই আমার সঙ্গে চলো। অন্যত্র না গেলে ঐ বিদ্যা সঠিক শিক্ষা করা যায় না।'

হাসান রাজী হলো এবং পিতার অনুমতি নিয়ে ব্রাহ্মণ পদ্মনাভের অনুগমন করল।

চলতে চলতে দামাস্কাস শহর ছেড়ে তাঁরা এক গভীর বনের মধ্যে এসে পেঁছিলেন। সেখানে একটি প্রাসাদোপম পোড়ো বাড়ী হাসানের চোখে পড়ল।

তাঁরা সেই ভগ্ন প্রাসাদে প্রবেশ করে, প্রকান্ড উঠানের মধ্যবর্তী এক কূপের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ হাসানকে বললেন ঃ 'হাসান! এই কূপের মধ্যেই তোমার কুবেরের ঐশ্বর্য লুকোন আছে।'

হাসান এ কথা শুনে অবাক।

অতঃপর ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ তাকে আশ্বস্ত করে অঙ্গবস্ত্রের অন্তরাল থেকে একটা কৌটো বার করলেন। ঢাকনা খুলতেই তার মধ্যে

শাদা শাদা কিছু চূর্ণ দেখা গেল। পদ্মনাভ চোখ বুজে কী যেন কয়েকটা মন্ত্রোচ্চারণ করে হাতের কৌটোটা উপুড় করে ধরে সমস্ত চূর্ণ পদার্থ সেই কূপের মধ্যে ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভোজবাজী ঘটে গেল। নিমেষে কূপের সমস্ত জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে শুকনো খট্‌খটে হয়ে পড়ল। হাসানকে নিয়ে পদ্মনাভ কূপসংলগ্ন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে পড়লেন।

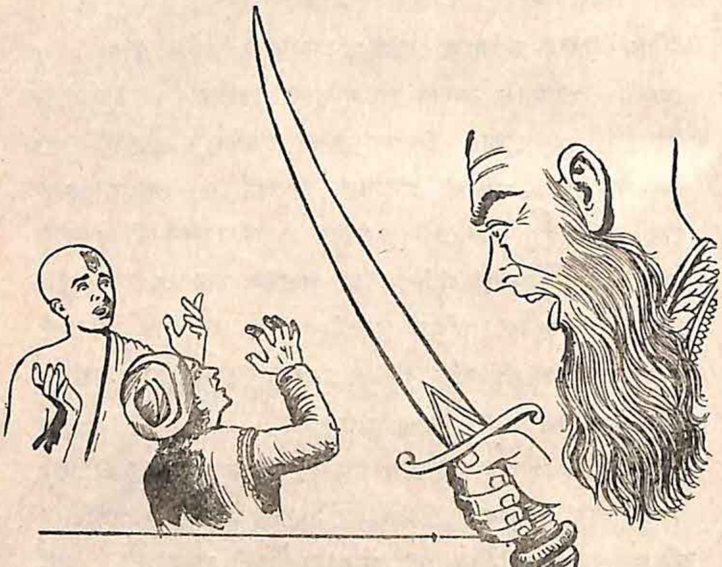
নীচে, কুয়োর তলদেশে ব্রোঞ্জের কপাটযুক্ত একটি দরজা দেখা গেল। পদ্মনাভ আবার মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। বন্ধ দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। উভয়ে প্রবেশ করলেন। সামনেই সুন্দর একখানি ঘর। অদৃশ্য আলোকে আলোকিত। দুজনে সেই ঘরে পা দেওয়া মাত্রই কোন গুপ্তস্থান থেকে একজন ভীষণ দর্শন হাবসী তাদের সামনে লাফিয়ে পড়ে পথরোধ করে দাঁড়াল। তার হাতে এক সুদীর্ঘ শাণিত তরবারি। সে এই দুই অনাহূত আগন্তুককে দেখেই দাঁত কড়মড় করতে করতে হাতের তরবারি উঁচিয়ে আঘাত হানতে উদ্যত হলো।

ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে পদ্মনাভের আড়ালে গিয়ে লুকোল হাসান। ব্রাহ্মণ কিন্তু নির্ভয়। তিনি একটি মন্ত্রোচ্চারণ করা মাত্রই সেই ভীষণ দর্শন হাবসী ঠিক কাটা কলাগাছের মতই ধড়াস করে পড়ে গেল মাটিতে। তার আর কোন জ্ঞান রইল না।

আবার তাঁরা এগোলেন। আর একটি রত্নরাজিমণ্ডিত সুন্দর কক্ষ পড়ল তাঁদের সামনে। সেই কক্ষে পা দেওয়া মাত্রই কোথা থেকে দুটি সিংহ এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। সিংহ দুটির হিংস্র গর্জনে প্রকম্পিত হয়ে উঠল সেই কক্ষ। তারা এঁদের লক্ষ্য করে আক্রমণে উদ্যত হলো। আল্লার নাম জপতে শুরু করলে হাসান। কিন্তু

এবারেও ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ে সিংহ দুটিকে অজ্ঞান করে ফেললেন। তাঁরা এবার অনায়াসেই সেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

এই ঘরের জাঁকজমক আর ঐশ্বর্য-বৈভব দেখে হাসানের মাথা ঘুরে গেল। ঘরটি আগাগোড়া সুবর্ণমণ্ডিত। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরের প্রথম কোণে হীরে-মাণিক, দ্বিতীয় কোণে সোনা-



রূপা; তৃতীয় কোণে বিভিন্ন অলংকার আর চতুর্থ কোণে কৃষ্ণ বর্ণের মৃত্তিকা সঞ্চিত রয়েছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে রূপোর পালঙ্কে রূপোর সিন্দুক। সিন্দুকের ওপর জনৈক রাজবেশধারী পুরুষের আবক্ষ স্বর্ণ-প্রতিমূর্তি।

হাসান জিজ্ঞাসা করল ব্রাহ্মণকে : 'জনাব! ইনি কে?'

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'ইনি মিশরের এক খ্যাতকীর্তি সম্রাট। ঘরের কোণে ঐ যে কৃষ্ণমৃত্তিকা আর তারই কাছে একখণ্ড শিলা দেখতে পাচ্ছ। এই দুই বস্তুর অশেষ গুণ। ওদেরই সাহায্যে মিশরের পরলোকগত এই সম্রাট এই সমস্ত অতুল ঐশ্বর্যরাশি সঞ্চয় করে গেছেন আর মন্ত্রবলে যুগ-যুগান্তর ধরে তার রক্ষার ব্যবস্থাও করে গেছেন।'

হাসান বলল, 'জনাব! কোন কোন পাথর শুনেছি বিশেষ অতি প্রাকৃত গুণসম্পন্ন। যেমন পরশপাথর। তা দিয়ে লোহাকে ছুঁলে লোহা নাকি সোনা হয়ে যায়। কিন্তু এই কৃষ্ণমৃত্তিকার গুণ কি?'

ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন, 'বৎস, এই মৃত্তিকা সম্বন্ধে তুর্কী ভাষায় একটি কবিতা আছে। তার সারমর্ম হলো এই— পূর্বদেশীয় একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে পশ্চিমদেশীয় সর্বগুণান্বিত রাজপুত্রের বিবাহ হবে। তাদের মিলনে যে সন্তান আসবে সেই সন্তান পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হবে। তার মানে এই যে—পূর্বদেশের আর পশ্চিমদেশের মৃত্তিকা একত্র মিশ্রিত করে কিছুদিন শিশিরে ভিজিয়ে রাখলে তাতে এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। সেই রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তামা ও টিন থেকে সোনা ও রুপা তৈরী করা সম্ভব। আর ঐ শিলা মর্মর শিলায় ছোঁয়ালেই তা থেকে মূল্যবান হীরা, মাণিক্য ইত্যাদি পাথর পাওয়া যাবে।

'বৎস হাসান! তুমি এবার মনে মনে ভেবে দেখ, আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে কতই না ঐশ্বর্যশালী করে তুলতে পারি। তবে পুত্র; আমি তোমাকে যাবজ্জীবন সুখী দেখতেই চাই।'

হাসান তখন একটু ইতস্ততঃ করে পদ্মনাভের কাছে জানতে চাইল;

সে তার পিতা-মাতার জন্য এই বিপুল ধনরাশি থেকে যৎসামান্য কিছু নিতে পারে কিনা।

ব্রাহ্মণ অনুমতি দিলেন।

পিতা-মাতার জন্য হাসান সেই ধনাগার থেকে অল্প পরিমাণে যা কিছু এনেছিল; তাদের পক্ষে তা-ই অনেক। হাসানের পিতা তাঁর দোকান তুলে দিয়ে একজন জমিদারের মতই আরামে-বিলাসে দিন কাটাতে লাগলেন।

হাসানের একটি বিমাতা ছিল।

তার চেহারাটি অতি সুন্দর হলেও মনটি ছিল অতি কুৎসিৎ। সে যখনই সুযোগ পেত হাসানকে নানান কুপরামর্শ দিত ব্রাহ্মণ পদ্মনাভের বিরুদ্ধে। বলত—'পুত্র! তুমি যা ধনরত্ন এনেছ, তা আর কতদিনের? এক সময় না এক সময় এসব শেষ হবেই। তখন? হিন্দুটা যদি তখন রাজী না হয় তোমাকে পুনরায় সেখানে নিয়ে যেতে? যদি সে মন পাল্টে ফেলে নিজের জাতের কোনও ছেলেকে সেই অতুল সম্পদ দান করে বসে? তখন? তাই আমার পরামর্শ শোন। তোমার ওপর হিন্দু ব্রাহ্মণটা সদয় থাকতে থাকতেই তার কাছে সেই দৌলতখানায় ঢোকবার আর বেরোবার মন্ত্রটা শিখে নাও। তারপর তাকে কোতল কর। যাতে আর না কাউকে সে তার ঐ বিদ্যেটা শিখিয়ে যেতে পারে। আমি বলছি, আমার মতলব মত কাজ করলে তুমি তো বটেই তোমার চৌদ্দপুরুষ অবধি রাজার হালে জীবন কাটাতে পারবে।'

বিমাতার এই ধরনের লোমহর্ষক ও কুৎসিৎ কথা শুনে হাসান তো স্তম্ভিত। ভীত। পরে সে আত্মসংবরণ করে যথেষ্ট নিন্দা করল আর ধিক্কার দিল বিমাতার নীচ মনোভাবকে।

বিমাতা কিন্তু অবিচল। নির্বিকার। পুত্রের তিরস্কারে বিন্দুমাত্র লজ্জা হলো না তার। প্রতিদিনই সে হাসানকে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল।

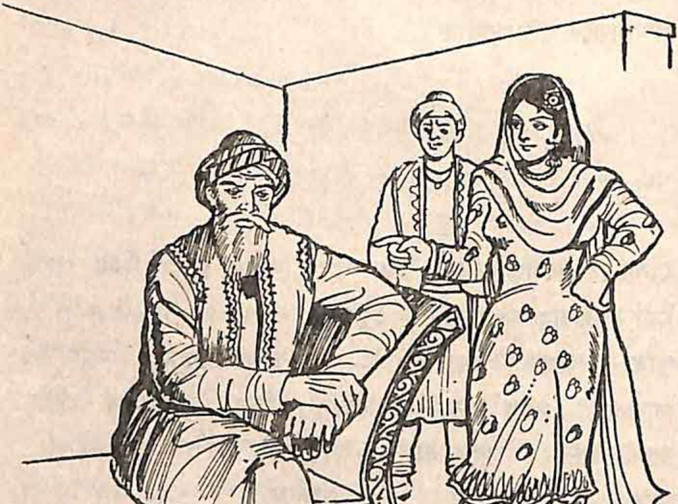
সত্যিই হাসান অনভিজ্ঞ, অপরিণতমনা বালকমাত্র। তাই কিছু-দিনের মধ্যেই তার যত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-দৃঢ়তা-কৃতজ্ঞতা সব ভেসে গেল বিমাতার কঠিন জেদের কাছে। সে রাজী হলো ব্রাহ্মণ পদ্মনাভকে হত্যা করতে।

হাসানের ঐকান্তিক ইচ্ছার কথা শুনে ব্রাহ্মণ প্রথম প্রথম তাকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করলেন। বললেন, 'গুপ্তবিদ্যা শিখে তুমি কী করবে? তাতে পরিণাম খুব সুখের হবে না। আমি কি পারতাম না সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে যেতে! কিন্তু তাতে বিপদ আছে বলেই নিইনি। শোন হাসান, বরং আমি তোমায় পুনরায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব সেখানে। তুমি তোমার প্রয়োজনমত অর্থ কিংবা যতখানি নিতে তোমার মন চায় ততখানি নিয়ে এসো সেই ধনাগার থেকে। কিন্তু এ বিদ্যা শিখতে চেয়ো না।'

হাসানকে কিছুতেই রাজী করাতে না পেরে স্নেহাসক্ত ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত দুঃখিত মনে তাকে শিখিয়ে দিলেন সেই গুপ্তবিদ্যা।

হাসানের পিতা মনজুরও তাঁর স্ত্রীর জেদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনিও সুযোগ খুঁজছিলেন পদ্মনাভকে চিরদিনের মত সরিয়ে দিতে। যেদিন শুনলেন ব্রাহ্মণ হাসানকে তাঁর গুপ্তবিদ্যা দান করেছেন, সেই-দিনই স্থির করলেন, আর বিলম্ব নয়, গুপ্ত ধনাগার থেকে ধনরত্ন নিয়ে ফিরেই পদ্মনাভকে বধ করবেন।

পিতা আর বিমাতাকে নিয়ে হাসান যথা নিয়মে প্রবেশ করল সেই গুপ্ত ধনাগারে। প্রথমবার এখানে আসার সময় যে যে বাধার



সম্মুখীন হয়েছিল হাসান, এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। কিন্তু ব্রাহ্মণ পদ্মনাভের শেখানো মন্ত্রের জোরে সব বাধাই পার হয়ে গেল একে একে। তার পিতা-মাতার মুখে কথাই নেই। ব্যাপার-

ব্যাপার দেখে তাদের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দাখিল।
প্রাণ তাদের গেল না বটে তবে জ্ঞান হারালো। বার বার অচেতন হতে লাগল তারা। প্রথমে বিপদে পড়ে, পরে অতুল ঐশ্বর্য দেখে। এত ধন-সম্পদ! এ দিয়ে তো তামাম দুনিয়াটাকেই কেনা যায়। বেয়াল্লিস পুরুষ রাজার হালে বসে বসে খাওয়া যায়।

তারা ঘুরতে ঘুরতে আর একটি ঘরের সন্ধান পেল। হাসান, মনজুর এবং তাঁর স্ত্রী সেই ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই এক মহা বিপদের সম্মুখীন হতে হলো সবাইকে। একদল মহাবলশালী আর বিভীষণ আকৃতির দৈত্য ঘিরে ধরল তাদের।

দৈত্যদের তর্জন-গর্জনে আর বীভৎস চেহারা দেখে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল তিনজনের। হাসান তো কেঁদেই ফেলল। গুরুর শেখানো রক্ষা-মন্ত্র পর্যন্ত সেই মুহূর্তে ভুলে বসল।

মনজুর স্ত্রীকে তিরস্কার করতে লাগলেন। বললেন—স্ত্রী বুদ্ধির বশবর্তী হয়েই আজ তাঁরা এই মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। হায় হায়, এখন কী সর্বনাশই না উপস্থিত হলো। মরতে কেন যে তিনি তার কুমন্ত্রণায় কান দিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাসান ইতিমধ্যে গুরুর নাম স্মরণ করে বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগল দৈত্যদের কাছে। মনজুরও নতজানু হয়ে যুক্তকরে তাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করতে লাগলেন।

দৈত্যদের মন এই সমবেত কাতর আবেদনে কতটা নরম হলো বলা কঠিন, তবে সেই মুহূর্তে অলক্ষ্য হতে শোনা গেল ব্রাহ্মণ পদ্মনাভের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর: 'তোরা মনে মনে ভেবেছিলিস, আমি তোদের দুরভিসন্ধির কথা কিছু বুঝতে পারিনি, না? তোরা যেমন হঠকারিতা আমার সঙ্গে করেছিস তার তেমনই

প্রতিফল তোদের পেতে হবে। আমার কাছে বিশ্বাসহন্তার কোনও ক্ষমা নেই। তোরা মর। আমি আর তোদের রক্ষা করব না।'

শূন্যবাণীও থেমে গেল আর দৈত্যরাও হাসান আর তার পিতা-মাতাকে; মানুষ ছারপোকাকে যেমন নখে টিপে মারে সেই রকম নখে টিপে মেরে ফেলল। একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

কাজীর বিচার

অনেক দিন আগে মিশর দেশে এক ফারাও রাজত্ব করতেন; তাঁর নাম ছিল আক্‌সিদ।

বহু বৎসর প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করার পর তিনি কালবশেই বৃদ্ধত্বে পদার্পণ করলেন। এবং ক্রমে ক্রমে এক পা এক পা করে জীবের চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে চললেন। যখন বুঝলেন তাঁর মৃত্যুর আর বিশেষ বিলম্ব নেই তখন তিনি তিন রাজপুত্রকে কাছে ডেকে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়, তার যাবতীয় সুবন্দোবস্ত করতে আদেশ দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে ফারাও আক্‌সিদকে রাজবেশ পরিয়ে খুব সাবধানে শয্যা থেকে তুলে এনে একটি বিবিধ রত্নরাজমণ্ডিত সিংহাসনে বসিয়ে এক বিরাট শোকমিছিল যাত্রা করল রাজকীয় সমাধিভূমিতে।

সমাধিভূমিতে উপনীত হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্তব্ধ হলো শোক-মিছিলের গতি। সিংহাসন সমেত ফারাওকে নামানো হলো মাটিতে। তারপর সমবেত জনতার ভেতর থেকে বিশেষ বিশেষ এক একজন ব্যক্তি এগিয়ে এসে এক এক কোদাল মাটি কেটে তুলে একটা প্রমাণ সাইজ কবর খুঁড়ে ফেললেন। ফারাওকে সেই মাটির খানিকটা এনে দিলে তিনি তার একমুঠো নিয়ে নিজের অঙ্গে লেপন করলেন।

অতঃপর যাবতীয় কর্তব্য কর্ম শেষ করে ফারাও রাজভৃত্য এবং রাজ কর্মচারীদের প্রত্যেককেই তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী যথাযথ পুরস্কার প্রদান করলেন। সাধু-সন্ন্যাসী, যাজক-পুরোহিত-মহন্ত এঁদের আশ্রম-মঠ-মন্দির-মসজিদ গীর্জা ইত্যাদি দেবালয় গঠনের জন্য কাউকে দিলেন নগদ অর্থ, কাউকে দিলেন নিষ্কর ভূমি।

সব শেষে ছেলেদের একান্তে ডেকে চুপিচুপি বললেন, 'বৎসগণ! আমার যাবার আর বেশী বিলম্ব নেই। আমি রাজনীতি সম্পর্কে যে যে উপদেশ তোমাদের দিয়েছি, সেগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে চললে তোমরা সুখে-শান্তিতেই দিন কাটাতে পারবে। তবে সব দুঃখ আর অশান্তিরই মূল কারণ হলো অর্থাভাব। তোমরা যাতে কোনদিন না অর্থাভাবে পড়ে কষ্ট পাও তাই আমি তোমাদের তিনজনের জন্যে অতুল রত্নরাজি সংগ্রহ করে এক গুপ্ত প্রকোষ্ঠে রেখে দিয়েছি। যদি তোমরা তিনজনে মিলে সারা জীবন ধরেই অমিত ব্যয় করে যাও, তবুও অর্থাভাব কি বস্তু তা তোমরা টের পাবে না। আমার শয়ন কক্ষের বায়ুকোণেই ঐ সমস্ত রত্নরাজি প্রোথিত আছে। আমার আদেশ—তোমরা তিনজন পুত্র সেই গুপ্তধন সমানভাবে ভাগ করে নেবে। কেউ যেন কম আর কেউ

যেন বেশী না পায়। আর কি বলব, আশীর্বাদ করি তোমরা দীর্ঘজীবী ও চিরসুখী হও।'

ফারাও আক্‌সিদ চুপ করলেন এবং চোখ বুজলেন। এবং সেই নীরবতাই হলো তাঁর চির নীরবতা। তিনি দেহত্যাগ করলেন।



বড় এবং মেজ রাজকুমার যখন পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত সেই অবসরে ছোট রাজকুমার সকলের অগোচরে পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে গুপ্তস্থান থেকে সমুদয় ধনরত্ন সরিয়ে নিলেন। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে, তাঁর দুই দাদা কিছুতেই আর খুঁজে পাবেন না এই ঐশ্বর্য। সিংহাসন তো তিনি পাবেন না। নাই পান তাতে ক্ষতি হবে না কোন। এই ধনরত্ন দিয়েই তিনি তাঁর বাকী জীবনটা রাজা-বাদশার হালেই কাটিয়ে দিতে পারবেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষে দুই ভাই একসঙ্গে প্রাসাদে ফিরে এসে দেখেন—সব বেবাক ফাঁকা। তাঁরা যুগপৎ বিস্মিত এবং বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। এমন সময় সেখানে ছোট রাজপুত্র গিয়ে উপস্থিত হলেন। দুই ভাই তাঁকে সবিস্তারে সব ঘটনা জানালেন। পরিশেষে

দুজনেই সন্দেহপ্রকাশ করলেন যে, যখন তাঁরা তিনজন ছাড়া আর কেউই এই গুপ্তধনের খবর জানেন না তখন এ কীর্তি ছোট কুমারেরই।

শুনে ছোট রাজকুমার তো চটেই লাল। তিনি পাল্টা তাঁদের ওপর দোষারোপ করে বললেন যে, তাঁকে পিতৃ-সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে এ সমস্ত তাঁদেরই চালাকি।

বড় রাজকুমার উত্তেজিত হয়ে উঠলেও মেজ রাজকুমার মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বললেন যে, সম্পত্তির বখরা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ করা উচিত নয়। তাতে শত্রুরা হাসাহাসি করবে—ভ্রাতৃ বিরোধের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে। সুতরাং তাঁদের উপস্থিত ক্ষেত্রে একমাত্র কর্তব্য হলো— এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধান কাজীসাহেবের শরণাপন্ন হওয়া। তিনিই এর ফয়সলা করে দেবেন।

মেজর কথায় বড় আর ছোট দুজনেই রাজী হলেন।

ডাকা হলো কাজীসাহেবকে। কাজী এসে সমস্ত কথা আনুপূর্বিক শ্রবণ করার পর বললেন, 'যুবরাজগণ! যদি আমাকে এই ঘটদার সত্যাসত্য স্থির করতে হয় তবে আগে আমার একটি কাহিনী শুনতে হবে আপনাদের। তার পরে বিচার।,

তিন রাজপুত্রই সম্মতি জানালেন কাজীর প্রস্তাবে।

অতঃপর কাজীসাহেব শুরু করলেন তাঁর কাহিনী—

—"কোনও একটি নগরে এক যুবক-যুবতী বাস করত। ছেলেবেলা

থেকেই তাদের মধ্যে ছিল খুব ভাব। যখন দুজনেই বড় হলো তখন কেউই কাউকে একদণ্ড না দেখে থাকতে পারত না। তারা স্থির করল তারা পরস্পরকে বিবাহ করবে। কিন্তু যুবতীটির একটি প্রবল বাধা ছিল—পিতার অনুমতি বা সম্মতি। সে জানতে পেরেছিল, তার পিতা তার সম্বন্ধ সেই শহরেরই একটি গুণবান ও ধনবান যুবকের সঙ্গে পাকাপাকি করেছেন। যুবতী তাই নিরুপায় হয়ে বিরলে বসে অশ্রুপাত করতে থাকে।

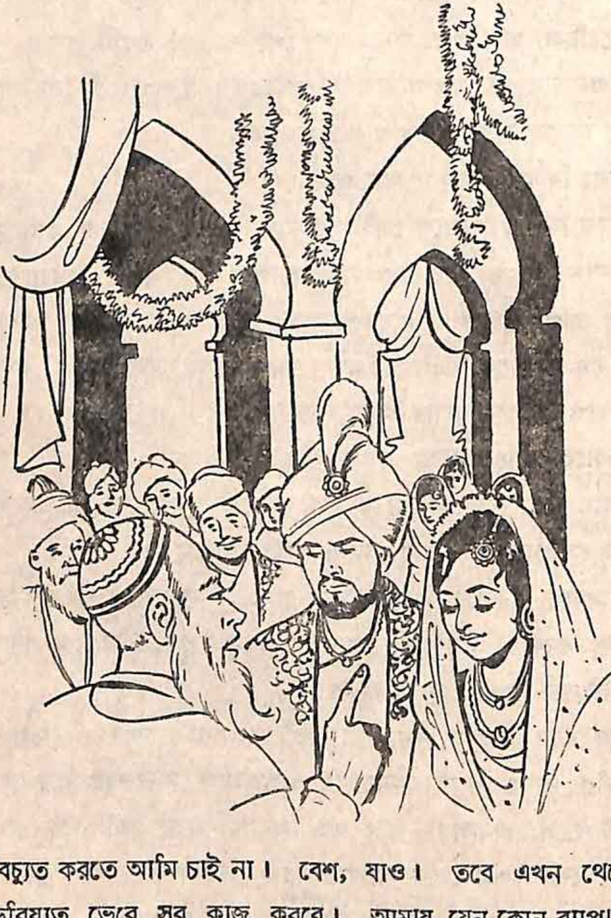
ক্রমশঃ বিবাহের দিন ঘনিয়ে এলো।

যেদিন বিবাহ, দৈববশে সেইদিনই যুবতী তার প্রিয়তম বন্ধুকে নির্জনে দেখতে পেয়ে তাকে সমস্ত ব্যাপার এবং নিজের অসহায়তার কথা জ্ঞাপন করলে। যুবকও অনেক হা-হুতাশ করে শেষে বলল যে, সে এই শহর চিরদিনের মত ত্যাগ করে চলে যাবে অন্য কোথাও। তবে যাবার আগে তার বান্ধবীকে একটিবারের মত—শেষবারের মত অন্তরঙ্গ ভাবে কাছে পেতে চায়। বান্ধবী কি আসবে? যুবকের অনুরোধ মত মেয়েটি বলল যে, যে ভাবেই হোক সে আসবে। তার বাসনা অপূর্ণ রাখবে না।

যথা সময়ে যুবতীর বিবাহ হয়ে গেল। নবদম্পতি বাসর-ঘরে প্রবেশ করল। নব পরিণীতা বধূকে বিমর্ষ ও গম্ভীর লক্ষ্য করে পাত্রটি তার কারণ জিজ্ঞাসা করল।

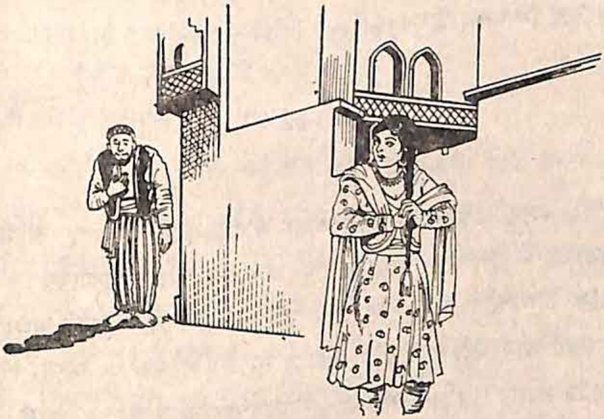
প্রথমে কোন ক্রমেই মুখ খুলতে রাজী হলো না যুবতী। তারপর স্বামীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও আশ্বাসে সে আশ্বস্ত হয়ে সব ঘটনা খুলে জানাল। এবং এও জানাল—মাত্র একটিবারই সে তাকে শেষ দেখা দেখে আসতে চায়। তার শপথ রাখতে তাকে সুযোগ দিলে সে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে তার স্বামীর কাছে।

স্বামীটি স্ত্রীর মনোবাসনার কথা শুনে অন্তরে অন্তরে কষ্ট অনুভব করলেও শুধু স্ত্রীকে সুখী ও সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে শান্ত ও গম্ভীর কণ্ঠে বলল; 'শপথ যখন করেছ তখন তা থেকে তোমায়



বিচ্যুত করতে আমি চাই না। বেশ, যাও। তবে এখন থেকে ভবিষ্যত ভেবে সব কাজ করবে। আমায় যেন কোন ব্যাপারে

কখনও হস্তক্ষেপ করতে না হয়—তোমার প্রতি এই আমার উপদেশ রইল।" বলে পাত্রটি নিজে তার স্ত্রীকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে। সকলেই ঘুমন্ত। তাই কেউ এই ঘটনা লক্ষ্য করল না। যুবতী মেয়ে একা-একা পথ চলেছে। হঠাৎ একটি চোরের সঙ্গে দেখা। চোরটি নির্জন পথে একাকিনী সালংকারা যুবতীকে



দেখে লোভাতুর হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

—'তুমি কে? এত রাতে একা একা এমন ভুবনমোহিনীর সাজে সেজে কোথায় চলেছ?' চোর জিজ্ঞাসা করল।

—'তুমি কে?' পাল্টা প্রশ্ন করল যুবতী।

—'আমি?' হাসল চোর। 'আমি এ শহরের সেরা চোর। আজ তোমাকে যখন বাগে পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না।'

ভয় পেয়ে গেল যুবতীটি। সে তার উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করে অনেক অনুনয় বিনয় করল চোরটিকে এবং তার কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সেরে অবশ্যই ফিরে আসবে সে

এখানে। চোরের মনোবাসনা পূর্ণ করবে। সব শুনে চোরের মনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। তার মনেও হঠাৎ মহৎ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। সে তো যুবতীকে স্বচ্ছন্দে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে যেতে দিলই উপরন্তু অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তির হাতে তাকে যাতে নিগৃহীত হতে না হয়, লাঞ্ছিত হতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে নিজে যুবতীটির দেহরক্ষী হয়ে তাকে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিল যথাস্থানে।

গভীর রাতে একাকিনী সালংকারা যুবতীটিকে নিজের আবাসে সত্যসত্যই উপস্থিত হতে দেখে যুবকের আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না। সে ভাবতেই পারেনি যে, যুবতী বাস্তবিক পক্ষেই তার কথা রাখবে। সাদরে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এহেন অসম্ভব আর দুরূহ কাজ সে কী করে সম্পন্ন করল জানতে চাইল যুবক। যুবতী ধীর কণ্ঠে একে একে সব বলে গেল তাকে।

যুবতীর স্বামীর মহত্ত্ব—চোরের মহত্ত্ব এবং তার প্রতি যুবতীর অসীম প্রণয় নিমেষের মধ্যে যুবককে পরিণত করল এক অতি মানুষে। তার মনের নীচতা—যুবতীর পিতা ও তার পতির প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা দূর হয়ে গেল। এই মুহূর্তে তার মনে হলো, তেমন কোন কাজ করলে সে মহত্ত্বের দিক দিয়ে সকলের কাছে খাটো হয়ে যাবে। সে তাই আর দ্বিরুক্তি না করে যুবতী যাতে তার এমন মহান স্বামীকে নিয়ে সুখী হয়ে সুখে-

স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে নিজেই তাকে পৌঁছে দিয়ে এলো তার বাড়িতে।'

কাহিনী সমাপ্ত করে কাজীসাহেব ফারাও আকাসিদের তিন পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, "যুবরাজগণ! আপনারা তিনজনেই যথেষ্ট বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। বলুন তো, ওদের মধ্যে কার মহত্ত্ব সবচেয়ে প্রশংসনীয় ?'

বড় রাজকুমার বললেন, 'যুবতীর স্বামীর।'

মেজ রাজকুমার বললেন, 'যুবকের।'

ছোট রাজকুমার বললেন, 'চোরের।'

তখন কাজীসাহেব ছোট রাজকুমারকে সম্বোধন করে বললেন, 'কুমার! আপনিই প্রকৃত দোষী। তাই চোরের সাধুতার প্রশংসা করলেন। আমার অনুরোধ, যা নিয়েছেন তা নিয়ে আসুন এবং তিন ভাই মিলে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রীতির ভাব বজায় রাখুন। আপনার দুই দাদা আপনাকে কনিষ্ঠ ভেবে নিশ্চয়ই আপনার প্রথম অপরাধ ক্ষমা করবেন।

দুই রাজপুত্রও সায় দিলেন সে কথায়।

ছোট রাজপুত্র ধরা পড়ে লজ্জায় বার করে দিলেন সব ঐশ্বর্য। তারপর দাদাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁদের সঙ্গে সমান ভাগে ভাগ করা নিজের অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট রইলেন।

শাহাজাদা কাজাম ও
শাহজাদী দিলওয়ারার কাহিনী

পূর্বকালে সিরিয়া প্রদেশে এক রাজা রাজত্ব করতেন, তাঁর তুল্য সর্বগুণসম্পন্ন নরপতি সে সময় খুব কমই ছিল।

যথা সময়ে তাঁর প্রধানা মহিষীর গর্ভে একটি পুত্র জন্ম লাভ করল। রাজা তাঁর রাজ্যের সেরা সেরা জ্যোতিষীদের ডেকে পুত্রের জন্ম-কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কুমারের কোষ্ঠীর ফলাফল কেমন দেখলেন?'

তাঁর উত্তরে জ্যোতিষীরা বললেন, 'মহারাজ! রাজপুত্র আপনার মতই সর্বগুণসম্পন্ন হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেবল একটি মাত্র গ্রহ প্রবল-প্রতিকূল থাকায় কুমারকে কিছুকাল অতিশয় ক্লেশ ভোগ করতে হবে। ষোল থেকে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নানান বিপদে পড়বেন তিনি। কখন কোন দিক দিয়ে কী বিপদ যে আসবে তা তিনি ধরতে পারবেন না। ত্রিশ বছর বয়স পার হলেই কুমার

আবার মেঘমুক্ত শশীর মতই নিজের রূপ গুণের ছটায় নিজেও উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন, আর দেশবাসীকেও মুগ্ধ করে তুলবেন।'

জ্যোতিষীদের কথায় রাজার মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু উপায় কী? নিয়তির বিধান রোধ করার ক্ষমতা তো তাঁর নেই।

রাজা তবুও শেষ চেষ্টা হিসেবে রাজপুত্রকে নিজের চোখে চোখে রাখবার ব্যবস্থা করলেন। অন্য কারুর উপর ভার ছেড়ে দিয়ে স্থির হতে পারলেন না।'

পিতার সাহচর্যে থেকে অল্প বয়সেই কুমার কাজীম পিতার মতই নানান রাজোচিত গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে উঠলেন। অস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতাও পেলেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁর বয়স হলো ষোল।

কিন্তু তখনও তাঁর কোনও বিপদ উপস্থিত হলো না।

একদিন রাজপুত্র কাজীম পিতার কাছে আবেদন করলেন যে তিনি সমুদ্র-ভ্রমণে যাবেন। রাজামশাই প্রথমে বিধিমত বাধা দানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্নেহেরই জয় হলো। তিনি জনকতক বিশ্বস্ত সহচরী আর অভিজ্ঞ নাবিক অনুচরের সঙ্গে পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন সমুদ্র যাত্রায়।

মনের আনন্দে প্রমোদপোতে চেপে রাজপুত্র সমুদ্র ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন দেশের উপকূলে পোতকে ভিড়িয়ে দিন কতক ঘুরে ফিরে সেই দেশ দেখে আবার ভেসে পড়ছেন অজানার উদ্দেশ্যে।

এইভাবে কয়েক মাস কাটল।

বিপদ ঘটল এইবার এবং অকস্মাৎ।

একদিন মধ্যরাত্রে একদল বোম্বেটে জলদস্যু তাঁর প্রমোদ পোত-টিকে আক্রমণ করে বসল। রাজপুত্রের অনুচরেরা প্রাণপণে বাধা প্রদান করল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো সবাই। দস্যুরা বন্দী করল সানুচর রাজপুত্রকে। লুট-পাট করল তাঁর প্রমোদ তরণী। আহতদের ফেলে দিল সমুদ্রে। তারপর বাকী বন্দীদের নিজেদের জাহাজে তুলে নিয়ে সামসাউ দ্বীপে এনে সেখানে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিল।

সামসাউ দ্বীপের অধিবাসীদের আকৃতি-প্রকৃতি ছিল অতি ভীষণ। তাদের দেহ মানুষের মত কিন্তু মুখ অবিকল কুকুরের মত। নরমাংস তাদের অতি প্রিয় আর উপাদেয় খাদ্য। তাই তারা সুযোগ পেলেই জলদস্যুদের কাছ থেকে বেশ চড়া দামেই বন্দী মানুষদের কিনত। দস্যুদের সঙ্গে তাদের একধরনের সমঝোতা ছিল তাই দস্যুদের কোন ক্ষতি করত না।

বন্দীদের কিনে নেবার পর তাদের একটি বন্দীশালায় আবদ্ধ করে উত্তম উত্তম খাবার দিত। দিন কতক এইভাবে খাইয়ে দাইয়ে বন্দীদের মোটা আর তাজা করে অবশেষে একদিন নিজেরাই খেয়ে নিত সেই বন্দীদের।

রাজপুত্র কার্জাম আর তাঁর অনুচরদের ভাগ্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। কুকুরমুখো লোকেরা কিছুদিন পরে রাজপুত্রের এক একজন অনুচরকে—তুলনায় যে অন্যের চেয়ে বেশী হৃষ্টপুষ্ট, তাকে বন্দীশালা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে, তার মাংসে উৎকৃষ্ট

ব্যাঞ্জন প্রস্তুত করে, খেতে আরম্ভ করল।

এইভাবে রাজপুত্র ক্রমশই সঙ্গীহীন হয়ে পড়তে লাগলেন এবং দুশ্চিন্তায় তাঁর শরীরও দিন দিন ক্ষীণ হতে শুরু করল। ফলে কুকুরমুখো লোকেরা রাজপুত্রকে দিনের পর দিন রেহাই দিতে লাগল।

কিন্তু একদিন আর তাঁর বাঁচবার উপায় রইল না। কারণ বন্দী-শালায় একমাত্র তিনিই ছিলেন তখন জীবিত বন্দী।

যথা সময়ে তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে একজন কুকুরমুখো লোক এসে উপস্থিত হলো সেখানে। প্রাণ তো এমনিতেই যাবে তবে একবারে কাপুরুষের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে মরে লাভ কি? অন্তত একজন শত্রুকে তো নিপাত করে মরা যাক।—এই ভেবে তিনি সহসা সাহসী হয়ে লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আচমকা এবং অচিন্ত্যনীয়ভাবে আক্রান্ত হয়ে লোকটি রাজপুত্রের চেয়ে অধিকতর বলশালী হয়েও



পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল। রাজপুত্র তাকে কাবু করে তারই তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

ইতিমধ্যে হতভাগ্যের মরণাহত চিৎকারে তার অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরা ছুটে এলো সেখানে। কিন্তু রাজপুত্র তখন ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছেন। তিনি শাণিত তরবারির আঘাতে একে একে সকলকেই ধরাশায়ী করলেন।

কেবল একজন কোন মতে আহত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে নিজেদের রাজাকে এই দুঃসাহসিক দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করল।

খবর পেয়ে রাজা তৎক্ষণাৎ অনুচর সমেত ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে। কুকুরমুখো অসভ্য জাতি হলেন তিনি রাজা এবং নানান রাজোচিত গুণাবলীতে বিভূষিত। রাজকুমার কার্জামের অসীম বীরত্বে তিনি প্রীত হলেন।

রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুবক তুমি কে?'

—'আমি সিরিয়া দেশের রাজপুত্র।' সগর্বে উত্তর দিলেন কার্জাম।

—'বিলক্ষণ। তোমার সাহস, বীরত্ব, রণচাতুর্য আর চেহারাই সাক্ষ্য দিচ্ছে তোমার বংশ পরিচয়। আমি খুবই প্রীত হয়েছি তোমার বীরত্বে তাই তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম। তুমি মুক্ত। আজ থেকে এই দ্বীপে তোমার অবাধ গতিবিধি রইল। আমার কোনও পুত্রসন্তান নেই—কেবল একটি কন্যারত্ন আছে। তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব এবং আমার মৃত্যুর পর এই দ্বীপের অধীশ্বর তুমিই হবে।'

রাজপুত্র কার্জাম মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন রাজার প্রস্তাবে। তাঁর বিবেক-বিবেচনা তাঁর কানে কানে বলল, 'কুমার, রাজার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করলে নিশ্চয়ই তোমার এই দ্বীপে জীবনধারণ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে—মনে রেখ।'

অগত্যা নিজের জীবনের জন্যই রাজকুমারকে রাজী হতে হলো রাজার প্রস্তাবে। আগামী কালই সেই শুভকাজ সম্পন্ন করবেন বলে রাজা জানালেন।

বিবাহ হলো খুব ধুমধামের সঙ্গে।

কিন্তু রাজকুমারের মন বিষণ্ণ। প্রাণে সুখ নেই।

কয়েক সপ্তাহ পরে হঠাৎই যেন রাজপুত্রের কপাল খুলে গেল। তিনি চির বিষণ্ণতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন।

কুকুরমুখী রাজকন্যা হঠাৎ এক উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়ে দিন কতক অশেষ যন্ত্রণা ভোগের পর একদিন মারা গেলেন।

হাঁফ ছাড়লেন কাজীম।

রাজপুত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বটে তবে সে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। তারপরেই সংবাদ পেলেন এই দ্বীপের নিয়ম অনুসারে তাকেও পত্নীর সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে। পতি মরলে পত্নীকে এবং পত্নী মরলে পতিকে সহমরণে যেতে হয়। এ রাজ্যে সেটাই নিয়ম। একমাত্র ব্যতিক্রম রাজার ক্ষেত্রে।

শুনেই তো কাজীমের মাথায় হাত পড়ল।

যথাবিহিত ভাবেই রাজপুত্র এবং মৃতা রাজকন্যাকে রাজকীয় সমাধিস্থলে এনে তাঁদের এক গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করা হলো। রাজ অনুচর এবং বিশিষ্ট প্রজারা প্রত্যেকে এক একটি পাথর দিয়ে সেই গহ্বরের মুখ বন্ধ করে চলে গেল। রাজপুত্র বন্দী রইলেন সেখানে। আশে-পাশে আরও অনেক নরকঙ্কাল খণ্ড-বিখণ্ড

অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঘৃণায় ভয়ে আর আতঙ্কে রাজপুত্রের তখন শোচনীয় অবস্থা। তিনি এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখছেন আর ভাবছেন কিভাবে এই মৃত্যুর গহ্বর থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে আবার উন্মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে ফেরা যায়। এমন সময় চোখে পড়ল অনেক দূরে যেন একটি রমণীমূর্তি হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে আলো-আঁধারীতে দেহ মিশিয়ে রহস্যময় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। রাজকুমার প্রথমে ভাবলেন তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। কিন্তু খানিকক্ষণ ধরে চেয়ে থেকেও যখন একই দৃশ্য দেখলেন, তখন বুঝলেন: না, দৃষ্টি বিভ্রম নয়—যা দেখছেন তা সত্যি সত্যিই দেখছেন। রাজপুত্র আশান্বিত চিত্তে ধীরে ধীরে এগোলেন সেইদিকে। কিন্তু কয়েক পা এগোতে না এগোতেই সেই আলো নিভে গেল।

আবার নিরাশার অন্ধকারে ডুবে গেলেন রাজকুমার।

এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারে একটি অশরীরী রমণীকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল ঃ কে তুমি যুবক ? এই ভয়াল স্থানে তুমি কি করছ ?'

রাজপুত্র সাহস সঞ্চয় করে নিজের পরিচয় এবং দুর্ভাগ্যের ইতিহাস শোনালেন তখন।

রমণী-কণ্ঠ তখন বলল, 'শুনলাম তোমার কথা। বেশ। এবার আমার কথা শোন—যদি তুমি আমায় বিবাহ করতে রাজী থাক তবে আমি তোমায় এই মারাত্মক বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি। বল, তুমি চাও ?'

রাজপুত্র কার্জাম দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, 'কোনও কুকুরমুখী মেয়েকে আবার বিয়ে করার চেয়ে আমি মৃত্যুকে বরণ করাই বেশী পছন্দ

করি।'

হেসে উঠল অদৃশ্য রমণী।—'ভয় নেই, আমি এই দ্বীপের কোনও মেয়ে নই। বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখে নাও আমায়।'

এই বলে রমণী তার প্রদীপটিকে আবার জ্বালল।

কাজীম দেখলেন, অদূরে এক পরমা সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

যুবতী বলল, 'এবার আমায় বিয়ে করতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না তোমার?'

কাজীম বিহ্বল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?'

—'আমি জর্জিয়া প্রদেশের রাজকন্যা। আমার নাম দিলওয়ারা। তোমার মত আমিও সমুদ্র ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ প্রবল ঝড়ে আমার জাহাজখানি ভেঙে পড়ে। আমি একটি ভাঙা তক্তার সাহায্যে ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপের তীরে এসে উঠি। আমায় রূপসী আর যুবতী দেখে এখানকার লোক আমায় হত্যা না করে একজনের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেয়। সৌভাগ্যবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই কুকুরমুখোটি মারা যায় এ দেশের রীতি অনুযারী তার সঙ্গে আমাকেও এই কবরে ফেলে যায় তার আত্মীয় স্বজনেরা। আমার স্বামী কুকুরমুখো হলেও সে আমাকে ভালবেসেছিল। সে-ই একদিন কথাচ্ছলে জানিয়েছিল তাদের দেশের রীতির কথা। আমি সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়েছিলাম। এবং প্রদীপ, প্রদীপ জ্বালাবার উপকরণ এবং আরো বহু জিনিস লুকিয়ে সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। তারা আমায় এখানে কবর দিয়ে যাওয়ার পর আমি একদিন প্রদীপ জেবলে উদ্ধারের পথ খুঁজতে থাকি এমন সময়ে আমার নজরে

পড়ে একটি শ্বেত পাথরের ফলক। তাতে দেখি আমার নাম খোদাই করা। সেই সঙ্গে তোমার নামও। আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে পড়ি পাথরটা দেখে। পাথরটাকে তোলার চেষ্টা করি কিন্তু শক্তিতে কুলোয় না। তারপর থেকে প্রতি রাত্রেই ঐ পাথরটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে আসছি। আমাদের যৌথশক্তি বিনা ঐ পাথরকে নাড়ানো যাবে না। তাই তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আজ আমার আশা পূর্ণ হলো। তুমি দেখবে সেই পাথর? তবে এসো।'

রাজকুমারকে সেই পাথরের কাছে নিয়ে গেল দিলওয়ারা। রাজকুমার দেখলেন রাজকুমারীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

পাথরের গায়ে পরিষ্কার লেখা রয়েছে—রাজপুত্র কাজীম আর রাজকন্যা দিলওয়ারা দুজনে একসঙ্গে যেদিন হাত লাগাবেন সেদিন এই পাথর উঠবে। এর নীচে পাওয়া যাবে তাঁদের মুক্তির পথ।

বিস্ময়ে এবং আনন্দে রাজপুত্রের হৃদয় প্লাবিত হলো। তিনি ভেবে পেলেন না; কে বা কারা কিভাবে তাঁদের নাম ও এখানে আগমনের ব্যাপার জেনে আগেভাগেই এরকম একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এ কি তবে কোন ঐশী ঘটনা?

কাজীম আর কাল বিলম্ব না করে রাজকন্যা দিলওয়ারাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে এবং তার সহায়তায় অনায়াসেই পাথরটাকে উপড়ে ফেললেন। রাজকন্যা দিলওয়ারা প্রদীপ জ্বাললেন চকমকি ঠুকে। সেই আলোয় একরাশ পাথরের সিঁড়ি তাঁদের দৃষ্টিগোচর হলো—ধাপে ধাপে নেমে গেছে ভূগর্ভে।

ভগবানের নাম স্মরণ করে সেই পথে পা বাড়ালেন তাঁরা।

কিছুদূর এগোবার পরই সিঁড়ি গিয়ে শেষ হলো একটি স্রোতস্বতী

নদীর কাছে। সেখানে একটি ক্ষুদ্র নৌকা জলে ভাসছে। রাজপুত্র আর রাজকন্যা গিয়ে তাতে চাপলেন।

নৌকা বাইতে বাইতে তাঁরা ক্রমশঃ সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বতী ছাড়িয়ে আর এক প্রশস্ত নদীতে এসে পড়লেন। দাঁড় আর বাইতে হলো না, স্রোতের টানে নৌকা নিজেই ভেসে চলল এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে।

নৌকা ভাসতে ভাসতে শেষে নিজেই ভিড়ল কূলে। কার্জাম আর দিলওয়ারা নামলেন ডাঙায়।

কোথায় আশ্রয় নেবেন? কী খাবেন দুজনে? এখানে আবার নতুন কোনও বিপদের সম্মুখীন হবেন কিনা—এইসব চিন্তা করতে করতে উভয়ে অগ্রসর হলের যেদিকে দুচোখ যায়। বেশ কিছুদূর এগোবার পরই তাঁদের চোখে পড়ল মনোরম একটি অট্টালিকা। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে ও আশায় তাঁরা সব ভয় দ্বিধা জয় করে প্রাসাদের প্রবেশ-পথে এসে দাঁড়ালেন।

প্রাসাদের চত্বরে নানান মূর্তি বিরাজ করছে। বিভিন্ন আকৃতির —বিভিন্ন বেশভূষার। প্রাসাদ তোরণে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে—'যদি কোন ব্যক্তি অষ্টপদ একটি প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট না করিয়া এই প্রাসাদে প্রবেশের উপক্রম করে তবে তাহার মৃত্যু অবধারিত।'

তোরণে লেখা পংক্তিকটি পাঠ করে তাঁরা দুজনেই স্থির করলেন এর মধ্যে ঢোকা আপাততঃ সুবিবেচনার কাজ হবে না। তারচেয়ে তাঁদের অন্যত্র সরে যাওয়াই ভাল।

রাজপুত্র কার্জাম আর রাজকন্যা দিলওয়ারা হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদ সংলগ্ন এক সুন্দর উদ্যানে প্রবেশ করে বিশ্রাম নিতে লাগলেন।

উদ্যানের গাছে যে ফল ছিল, ফোয়ারায় যে জল ছিল তারই সাহায্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করলেন।

অতঃপর রাজকুমার বললেন, 'দিলওয়ারা এবার তোমার রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনাও। তারপর দুজনে মিলে পরামর্শ করে দেখবখন ঐ পুরীতে প্রবেশ করা উচিত কি অনুচিত। নাও, বলো তোমার কাহিনী।

রাজকুমারের আগ্রহ লক্ষ্য করে রাজকুমারী দিলওয়ারা অগত্যা বলতে শুরু করলেন নিজের কাহিনী—

'স্বামী! আমার পিতা জর্জিয়া প্রদেশের রাজা। আমি ছাড়া তাঁর আর কোনও সন্তান-সন্ততি নেই। কাজে কাজেই তিনি বড়ই স্নেহ করতেন আমায়। ক্রমে আমি বড় হলাম। আমার বিবাহের বয়স ও সময় হলো। পিতা তখন দেশ বিদেশে আমার জন্য একজন সুপাত্র খুঁজতে লাগলেন।

'আমাদের রাজ্যের যিনি প্রধান উজীর ছিলেন তাঁর একটি পুত্র ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তার সংগে আমার খুব ভাব ছিল। বড় হয়ে সেই ভাব আরও গভীর হয়।

'এইভাবে দিন কাটে—

'একদিন পিতা সভায় বসে রাজকার্য সম্পন্ন করছেন এমন সময় একজন ভিনদেশী রাজদূত সেখানে উপস্থিত হয়েউ পযুক্ত শিষ্টাচার দেখিয়ে বললেন যে, তিনি কায়রো থেকে এসেছেন তাঁর প্রভুর দূত হয়ে। তাঁর প্রভু মিশরপতি জর্জিয়ার রাজকন্যার রূপগুণের সংবাদ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে অভিলষিত

হয়েছেন।

'দূতের মুখে স্বয়ং মিশররাজের অভিলাষের কথা শুনে আমার পিতা বিশেষ পুলকিত হলেন। অমন প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটকে জামাতা হিসেবে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। তিনি তাই সহজেই রাজী হয়ে গেলেন।

মিশর দেশের নিয়ম—সেখানকার পাত্র কন্যাকে বিবাহ করতে তার বাড়ী যায় না; পাত্রীকেই বিবাহ করার জন্য পাত্রের বাড়ীতে আসতে হয়। ফলে আমাকেও তাই করতে হলো। পিতা আমাকে উপযুক্ত যৌতুক-সামগ্রী এবং দাস-দাসী লোকজন সমেত সেই ভিনদেশী রজদূতের সঙ্গে মিশরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন।

'যথাদিনে মিশরের সেই রাজদূতের সঙ্গে জাহাজে চেপে তাঁদের দেশের উদ্দেশ্যে ভারাক্রান্ত মনে যাত্রা করলাম। তার পরের ঘটনা তো তোমাকে আগেই শুনিয়েছি—আমার জাহাজ ডুবির কথা... এই দ্বীপে আশ্রয় পাবার কথা...একজন কুকুরমুখোর সঙ্গে জবরদস্তি বিবাহের কথা ইত্যাদি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে শেষ পর্যন্ত তিনি তোমাকে পাইয়ে দিলেন আমায়।

রাজপুত্র কার্জাম গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে এতক্ষণ নিমীলিত নয়নে রাজকুমারীর দিকে চেয়ে নিবিষ্ট মনে তাঁর কাহিনী শুনছিলেন। সহসা তাঁর নজরে পড়ল একটি আট পাওলা কাঁকড়া বিছে রাজকুমারীর ঠিক কোমরের কাছে হুল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি ঈষৎ সেদিকে হেললেই তাঁকে হুলবিদ্ধ করবে।

কার্জাম চঞ্চল হয়ে উঠলেন এই দৃশ্যে। তিনি রাজকুমারীকে সম্বোধন করে বললেন, 'রাজকুমারী, তোমার কোমরের কাছেই

একটি কাঁকড়া বিছে হুল উঁচিয়ে অবস্থান করছে। সাবধান! তুমি চট্ করে একপাশে সরে যাও। তারপরের ব্যবস্থা আমি করছি।'

রাজপুত্রের নির্দেশ মত দিলওয়ারা খুব সাবধানে অথচ তড়িৎ গতিতে একধারে লাফিয়ে পড়লেন। কার্জমও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জুতোশুদ্ধ পা দিয়ে মাড়িয়ে বিছাটাকে মেরে ফেললেন।

সেই মুহূর্তে আর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন অদূরস্থিত বিরাট প্রাসাদের প্রকাণ্ড বন্ধ ফটক ঘর ঘর শব্দে আপনা আপনি খুলে যাচ্ছে।

অতঃপর নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে তাঁরা সেই প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

সমস্ত প্রাসাদ ঘুরে দেখতে দেখতে তাঁরা একটা বাগানে এসে পড়লেন। ভারী সুন্দর বাগান। নির্মল জলের সরোবর, রংবে-রঙের ফুলের গাছ, নানাবিধ ফলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষে সুসজ্জিত। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে ঘুরতে বেশ ক্ষুধা পেয়েছিল তাঁদের কিন্তু প্রসাদের কোথাও কোন খাদ্যবস্তু না থাকাতে এখন ফলের গাছগাছালিকে দেখে তাঁরা খুব খুশি হয়ে উঠলেন।

ফল পাড়তে গিয়েই কিন্তু অবাক হতে হলো তাঁদের। এ তো সাধারণ ফল নয়। এযে খাঁটি সোনার ফল। ক্ষুধা না মেটাতে পেরে হতাশ হয়ে তাঁরা সরোবরে গেলেন জল খেতে সেখানে গিয়েও অবাক।

দেখলেন—সরোবরের সিঁড়িগুলো সোনার, জলের তলাকার নুড়ি-

পাথরগুলি নানা রকম দামী দামী রত্ন আর মাছগুলি সব রুপার। রাজকুমার আর রাজকুমরী ভাবলেন তাঁরা নিশ্চয়ই কোনও ঐন্দ্রজালিকের পুরীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

কোনও মতে জলপিপাসা নিবারণ করে আবার তাঁরা প্রাসাদ পুরীতে প্রবেশ করলেন।

একটি ঘরে ঢুকে দেখলেন—সেটির মেঝে; দেয়াল ও ছাদ সম্পূর্ণ স্বর্ণ খচিত। সেই ঘরের স্থানে স্থানে মহার্ঘ মণি-মুক্তা ও বিবিধ রত্নরাজি স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। অথচ কোথাও কোন পাহারা নেই। ঘরের একপাশে আরও একটি রুপার তৈরী কপাট। সেই কপাট খুলে তাঁরা আর একটি কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন—জনৈক তেজস্বী ও জ্যোতির্ময় বৃদ্ধ পুরুষ একটি সোনার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে তাদের দিকেই তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন। মাথার চুল মুখের দাড়ি-গোঁফ সবই তুষারের মত শুভ্র। হাতের নখগুলি দীর্ঘ কিন্তু পরিষ্কার। গাত্রচর্ম লোল কিন্তু উজ্জ্বল। তাঁর যে কত বয়স তা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য।

বৃদ্ধ কিন্তু কোন মূর্তি নন—জীবন্ত মানুষ।

গম্ভীর স্বরে তিনি এঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমরা কারা? আর কেনই বা আমার প্রাসাদে প্রবেশ করেছ?'

রাজপুত্র কার্জাম সসম্ভ্রমে বৃদ্ধকে অভিবাদন করে প্রথমে নিজেদের পরিচয় দিলেন তারপর এখানে প্রবেশের পূর্ব অবধি সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করলেন।

বৃদ্ধ সন্তুষ্ট এবং দয়াবান হলেন তাঁদের ওপর আর তাঁদের যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকতে অনুমতি দিলেন।

নিজের পরিচয় হিসেবে বৃদ্ধ জানালেন—'আমি প্রাক্তন চীন সম্রাট হো-তাং। নানান কারণে স্বরাজ্য ত্যাগ করে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। যাদুবিদ্যায় আমার বিশেষ পারদর্শিতা থাকায় তার প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত দৈত্য-দানব আমার আজ্ঞাধীন। তারাই আমার বসবাসের জন্য এই প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছে। এখানে পার্থিব কোন কুপ্রবৃত্তির আধিপত্য নেই। তোমাদের দেখে আমার নিজের পুত্র ও কন্যার কথা স্মরণ হচ্ছে। এখানে তোমরা থাকো। আমার যা কিছু আছে সবই তোমাদের দেব উপরন্তু আমার ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাও তোমাদের শিখিয়ে দেব।'

কার্জাম আর দিলওয়ারা রাজী হলে বৃদ্ধ সম্রাট তখন তাঁদের আহার ও বাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

দেখতে দেখতে দুটি বছর পার হলো সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে।

রাজকুমারী দিলওয়ারা ইতিমধ্যে মা হয়ে যমজ সন্তানের জন্ম দিলেন।

ছেলে দুটি ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে পাঁচ বছরে পড়ল। বৃদ্ধ সম্রাট তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন পালনের ভার নিজের অনুচর দৈত্যদের হাতে তুলে দিলেন।

আরো দুবছর পার হলো।

একদিন দিলওয়ারা স্বামীকে নিজের মনোবেদনার কথা প্রকাশ করে জানালেন যে, অনেকদিন তিনি তাঁর পিতার-মাতাকে দেখেন নি। তাঁদের দেখবার জন্য ভারী মন কেমন করছে। বিশেষ

করে গতরাত্রে পিতাকে স্বপ্ন দেখার পরই তাঁর মন খুবই উতলা হয়ে উঠেছে তাঁকে দেখার জন্য।

রাজকুমার কার্জামও সেই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন। তাঁরও বাড়ির জন্য মন উচাটন করছে।

তারপর পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে কার্জাম গেলেন সেই বৃদ্ধের কাছে এবং নিজেদের মনোবাসনার কথা তাঁকে জানালেন।

কার্জামের কথায় বৃদ্ধ খুবই বিষণ্ণতা বোধ করলেন। মনে মনে এতদূর আঘাত পেলেন যে তিনি হঠাৎ সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়লেন। কার্জাম আর দিলওয়ারা সশব্যস্তে বৃদ্ধের শুশ্রূষা শুরু করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না তিনি দেহত্যাগ করলেন।

আর কি আশ্চর্য ব্যাপার।

বৃদ্ধের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাজকুমার আর রাজকুমারীর চারপাশের দৃশ্যপট বদলে গেল। সবকিছু এমনকি বৃদ্ধের মৃতদেহ পর্যন্ত ভোজবাজীর মত কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কার্জাম আর দিলওয়ারা দেখলেন—পুত্রদের নিয়ে তাঁরা এক বিজন বনে বসে আছেন।

অনেক কষ্টে আর অনেক পরিশ্রমে একটা নৌকা তৈরী করে সপরিবারে নদীপথে দেশে ফিরছেন কার্জাম। নৌকা যখন প্রায় মোহনার কাছাকাছি সেই সময়ে আবার দুর্ভাগ্য জালে জড়িয়ে পড়তে হলো তাঁদের। তাঁরা আবার সপরিবারে বন্দী হলেন একদল জলদস্যুর হাতে। জলদস্যুরা সমুদ্রমধ্যস্থিত এক দ্বীপে কার্জামকে

একাকী পরিত্যাগ করে তাঁর স্ত্রী আর পুত্রদের নিয়ে চলে গেল।
সেই নির্জনদ্বীপে পরিত্যক্ত হয়ে কার্জাম অনেক কান্নাকাটি করলেন, ঈশ্বরকে অনেক ডাকলেন, কিন্তু কোন সুরাহা হলো না। শেষে তিনি মনে মনে ভাবলেন, একেবারে হাল ছেড়ে দিলে হবে না। প্রাণ রক্ষার একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে। তারপর দেখতে হবে কীভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

উঠলেন কার্জাম। ধীরে ধীরে সমুদ্রতীর ছেড়ে দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে প্রবিষ্ট হতে লাগলেন। কিছুদূর এগোবার পরই যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল তাতে তিনি শিউরে উঠলেন।

দ্বীপটি তবে নির্জন নয়।

তবে এ দ্বীপে যারা থাকে তারা সাধারণ মানুষ নয়। দুর্জন। অমানুষ। কারণ তিনি দেখলেন—দীর্ঘকায় বলশালী বিভৎস দর্শন একদল মনুষ্যাকৃতি প্রাণী—যাদের কাঁধের ওপর মাথা নেই —মাথা রয়েছে বুকে আর পেটের মাঝামাঝি স্থানে—তারা তাকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে সকলে।

প্রথমে খানিকটা হতভম্ব হয়ে পড়লেও শেষ মুহূর্তে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন কার্জাম। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ফলবতী হলো না তিনি অসহায়ের মতো বন্দী হলেন তাদের হাতে। তারা তাঁকে নিয়ে গেল তাদের রাজার কাছে।

রাজামশাইকেও দেখতে সেই রকম। তবে তিনি সব দিক দিয়ে আরো বড় মাপের।

তাঁর কাছে অভিযোগ জানানো হ'লো যে, কাজ'াম একজন বিদেশী গুপ্তচর। সন্দেহজনকভাবে দ্বীপের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিলেন। রাজামশাই তাকালেন কার্জামের দিকে। দেখে বেশ মুগ্ধ হলেন। অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বললেন, 'কে তুমি যুবক? কি জন্যই বা এখানে এসেছ?'

কার্জাম তখন নিজের বিবরণ শোনালেন রাজাকে। শুনে তিনি বিশ্বাসই করলেন এবং রাজকুমারকে অভয় দিলেন, পরে বললেন; 'বিদেশী রাজপুত্র, আমি তোমাকে প্রাণদান দিলাম, তার পরিবর্তে আমার একটি কাজ তোমার করে দিতে হবে।'

—'কী কাজ মহারাজ?'

—'এই দ্বীপের পাশে আর একটি দ্বীপ আছে। সেখানে রাজত্ব করেন আর এক প্রতাপশালী রাজা। তাদের দেখতে মানুষের মতই তবে মাথা পাখির মত। কথাও বলে পাখিদের আওয়াজে। তাদের সঙ্গে আমাদের দারুণ রেষারেষি। শুনলাম তারা নাকি বিস্তর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্রবল রণসজ্জা করে আমাদের অবিলম্বে আক্রমণ করবে। আমি তোমাকে আমার দলের প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করতে চাই। আমি প্রবীণ ব্যক্তিদের কছে শুনেছি; তোমাদের জাতি দৈহিক শক্তিতে আমাদের অপেক্ষা ন্যূন হলেও; বুদ্ধিশক্তি ও জ্ঞানে অনেক বেশী শক্তিশালী। আশা করব আমাদের শক্তি আর তোমার বুদ্ধি এই দুই মিলে তাদের শক্তিকে অনায়াসেই পর্যুদস্ত করতে পারব।'

বাধ্য হয়ে কাজ'াম সম্মত হলেন।

কবন্ধ রাজের আশংকাই সত্য হলো। ছ'মাসের মধ্যেই পার্শ্ববর্তী দ্বীপের বিহগ রাজ আক্রমণ করলেন কবন্ধরাজের রাজ্য। কিন্তু

এই ছ'মাসে রাজকুমার কার্জামের শিক্ষা গুণে কবন্ধ সৈন্যরা আগের চেয়ে অনেক রণনিপুণ যোদ্ধা হিসেবে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া কার্জাম নিজে ছিলেন তাঁর অতুলনীয় রণনৈপুণ্য নিয়ে। ফলে বিহগরাজ পরাজিত হয়ে স্বরাজ্যে পালালেন। জয় জয় কার হলো কার্জামের। তিনি কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট হলেন না। বিহগ রাজকে ধাওয়া করে তাঁকে বন্দী করে এনে হাজির করলেন কবন্ধরাজের সামনে। যে কাজ সম্ভবপর বলে কোনদিনই কেউ কল্পনা করেনি কোন দ্বীপের অধিবাসীরা। রাজকুমার তাই করলেন।

কবন্ধরাজ খুবই সন্তুষ্ট হলেন কার্জামের ওপর। এতদূর সন্তুষ্ট হলেন যে তিনি কার্জামকে নিজের জামাতা করতে মনস্থ করলেন। প্রস্তাব শুনেই তো রাজকুমার কার্জাম চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলেন। একজন কবন্ধীকে বিয়ে করার চেয়ে যে রণক্ষেত্রো মৃত্যুও ভাল ছিল। হায় হায়! এখন তিনি কি করবেন?

রাজকুমার ঘোর অসম্মতি জানালেন এই কথায়।

ফলে কবন্ধরাজ খুবই ক্রুদ্ধ হলেন কার্জামের ওপর এবং অত কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর প্রাণ বিনাশে কৃতসংকল্প হলেন। তাঁর ধারণায় কার্জাম তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে রীতিমত অপমান করেছেন।

কার্জামের সমস্ত অসম্মতি অগ্রাহ্য করে কবন্ধরাজ শেষে জোর করেই নিজের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন।

যথাকালেই এই বিবাহ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হলো।

বর-বধূ যখন বাসরে একা হলেন তখন কার্জামের বিষণ্ণ আর বিরস মুখভাব লক্ষ্য করে কবন্ধ রাজনন্দিনী বিনম্র বদনে বললেন, 'স্বামী! আমি তোমার মনোভাব বুঝতে পারছি। শুনে তুমিও হয়তো সুখী হবে যে, এ বিবাহে আমিও তোমার মত অসুখী হয়েছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এ কাজ হয়েছে। একজন প্রবল পরাক্রান্ত ভিনদেশী দৈত্যকে ভালবাসি। আমরা দুজনেই বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হতে সমোৎসুক। সে যদি এই ঘটনার বিষয় জানতে পার তবে মহা অনর্থ বাধাবে। আজই তার সঙ্গে আমার অভিসারের রাত্রি। তুমি নিরপরাধ। দৈত্য এলে আমি তাকে সব বুঝিয়ে বলে তোমার প্রাণভিক্ষা চাইব আর তুমি যাতে এখান থেকেউদ্ধার পেলে স্হানান্তরে যেতে পার—তার জন্য তার সাহায্য চাইব। তুমি দুঃখ করো না।'

যথাকালে দৈত্য এলো রাজনন্দিনীর সমীপে। তারপর তাঁর কাছে



সব বিবরণ অবগত হয়ে কবন্ধ রাজকুমারীর অনুরোধ মত দুজন-কেই উড়িয়ে নিয়ে গেল আর একটি দ্বীপে। সেখানে কার্জামকে

ছ ড়ে নিজেরা চলে গেল কাছাকাছি আর একটি দ্বীপের একটি সুরম্য অট্টালিকায়।

কার্জাম ঘুরে ঘুরে দেখছেন সেই দ্বীপের দৃশ্য। পরিস্থিতি বদল হয়নি হয়েছে কেবল পরিবেশের। তবু তিনি আনন্দিত। সহসা দেখলেন জনৈক বৃদ্ধ সমুদ্রস্নান করছেন অদূরে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে; তিনি তাঁরই মত দেখতে স্বাভাবিক অবস্থার সাধারণ মানুষ।

কার্জাম তখন ধীরে ধীরে তাঁর দিকে এগোলেন।

রাজপুত্রকে দেখে বৃদ্ধও অবাক! তিনি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

রাজপুত্র কার্জাম নিঃসংকোচে নিজের পরিচয় দিলেন।

শুনে বৃদ্ধ বললেন; 'পুত্র; তোমার পরিচয় পেয়ে প্রীত ও তোমার দুর্ভাগ্যের বিবরণ অবগত হয়ে দুঃখিত হলাম। সবই অদৃষ্ট। এ কথা আমি আগেই জানিয়েছিলাম তোমার মহামান্য পিতাকে।'

কার্জাম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন; 'আপনি আগেই আমার বিবরণ জানতেন? কেমন করে জানলেন?'

বৃদ্ধ ম্লান হেসে উত্তর দিলেন; 'বৎস! তোমার পৈতৃক রাজ্য সিরিয়া আমারও জন্মভূমি। আমি সেদেশের একজন খ্যাতনামা গণৎকার ছিলাম। আমিই তোমার জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত করি। তুমি জলদস্যুদের হাতে বন্দী হলে তোমার পিতা অনেক চেষ্টা করেছিলেন তোমার উদ্ধারের কিন্তু তোমার কোনও সন্ধান করতে

না পেরে তিনি মনোকষ্টে অকালে দেহত্যাগ করেন। সিংহাসন কখনও খালি থাকে না। তাই তোমার অভাবে প্রজারা তোমার এক পিতৃব্যকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করে। তিনি রাজপদ পেয়েই আমাকে ডেকে এনে হুকুম করেন তাঁর রাজত্বের ভাল-মন্দ ভবিষ্যৎ গণনা করে দিতে। আমি গণনা করে জানলাম যে—তিনি পদে পদে বিপদাক্রান্ত হবেন এবং তাঁর অবিবেচনামূলক কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে জনসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে তাঁর জীবন সংশয় করে তুলবে। তোমার পিতৃব্য এই কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে সেই দণ্ডেই আমাকে সিরিয়া রাজ্য থেকে দূর করে দিলেন। আমি তখন মনের দুঃখে নানান দেশ ঘুরতে ঘুরতে একসময় এই দ্বীপে এসে উপস্থিত হই। দ্বীপটি আমার বিশেষ ভাল লাগে। সেই থেকে এখানেই আছি এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই কাটাব স্থির করেছি। এই দ্বীপ একজন সদাশয়া মহানুভবা রাণীর কর্তৃত্বাধীনে। তাঁর সুশাসনে এখানকার অধিবাসীদের কোন কষ্ট নেই।'

পিতার মৃত্যু সংবাদে রাজপুত্র যারপরনাই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ তাঁকে বিবিধ প্রকার সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করে নিয়ে গেলেন এই দ্বীপের অধিকর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে।

রাণীকে দেখে কাজেম আর কাজেমকে দেখে রাণী দুজনের বিস্মিত, স্তম্ভিত আর পুলকিত।

রাণীসাহেবাই কাজেমের প্রিয়তমা পত্নী দিলওয়ারা।

হর্ষ-উচ্ছ্বাস শেষ হলে কাজেম তাঁর পুত্রদের সংবাদ নিলেন।

দিলওয়ারা বললেন যে, তারা কাছাকাছিই অরণ্যে শিকারে গেছে। যে কোন সময়েই এসে পড়তে পারে।

অতঃপর কার্জাম নিজের কাহিনী শোনাবার পর দিলওয়ারা তাঁর কাহিনী শুরু করলেন ঃ

—'দস্যুরা তোমায় সেই দ্বীপে ছেড়ে রেখে আমাকে নিয়ে অগ্রসর হলো এক অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে। হঠাৎ মাঝরাতে উঠল প্রবল ঝড়-তুফান। দস্যুদের জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেই প্রচণ্ড ঝড়-তুফানে। আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে ছেলে দুটিকে বুকে নিয়ে একখণ্ড ভাঙা কাঠ অবলম্বন করে কোনও রকমে ভেসে রইলাম সমুদ্রবক্ষে। সকলেই ডুবে মরল। শুধু আমি আর আমার পুত্রেরা কোন গতিকে ভাসতে ভাসতে স্রোতের টানে এই দ্বীপের তটে এসে আটকালাম।

'হয়তো অনাহারে ক্ষুৎপিপাসায় এবং দুর্বলতার জন্য মারাই পড়তাম তিনজনে কিন্তু ঈশ্বরই পুনরায় রক্ষা করলেন সকলকে। জনকয়েক ধীবর আমাদের দেখতে পেয়ে প্রাণে বাঁচাল। তারপর তারাই আমাদের সুস্থ-সবল করে তুলে পেঁাছে দিলে এখানকার রাজার কাছে।'

বৃদ্ধ রাজামশাই আমার বিবরণ শুনে ও পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রাসাদে স্থান দিলেন সসম্মানে এবং আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির কিছু কিছু নিদর্শন পেয়ে আমাকে তাঁর প্রধান পরামর্শদাত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন।

আমার পরামর্শ মত চলে রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি সাধন করতে পেরেছিলেন রাজামশাই। তাই তিনি আমার উপর খুবই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিলেন।

একদিন তিনি আমায় জনান্তিকে জানালেন যে, তাঁর কোনও সন্তানাদি না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর ওই রাজ্য পাঁচভূতে লুটে খাবে। তিনি তা চান না। তাঁর পরিশ্রমে আর আমার বুদ্ধিতে গড়ে তোলা এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য তিনি আমাকেই সম্প্রদান করতে চান। তাতে এ রাজ্যের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না। এ ব্যাপারে একটি মাত্র উপায় আছে তা হলো আমাকে তাঁর বিবাহ করা। আমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছি কিনা।

আমি পুত্রদের ভাবী সুখের আশায় এবং বৃদ্ধ রাজার আর বেশীদিন আয়ুষ্কাল নেই বিবেচনা করে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলাম। আমাদের বিবাহ হলো। বিবাহের মাসখানেক পরেই বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করলেন। তখন নিয়ম অনুসারে রাজ্যের অধীশ্বরী হলাম আমি। তারপর এতদিন পরে তোমার আগমন ঘটল। এবার আমাকে এদেশীয় নিয়ম অনুসারে পুনরায় বিবাহ করে তুমি রাজা হও।

ইতিমধ্যে কার্জামের পুত্ররাও মৃগয়া থেকে প্রত্যাগমন করল। মায়ের মুখে প্রকৃত পিতৃ-পরিচয় পেয়ে তারা পিতার চরণে প্রণত হলো। কার্জাম তাদের বুকে চেপে ধরে শিরশ্চুম্বন করলেন।

কিছুদিন পরে রাণীসাহেবা দিলওয়ারার সঙ্গে কার্জামের পুনরায় বিবাহ সংঘটিত হলো। কার্জামই সে দেশের রাজা হলেন এবং পিতার ন্যায় প্রজাপালন করতে লাগলেন। তাঁর দিন স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখেই কাটতে লাগল।

ঈশ্বরের বিচার

বহুকাল আগে প্যালেস্টাইন প্রদেশে এক সর্বগুণান্বিত রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর কোন কিছুরই অভাব ছিল না একমাত্র পুত্রের অভাব ছাড়া। এর জন্য রাজা মধ্যে মধ্যে খুবই বিষণ্ণ আর চিন্তিত হয়ে পড়তেন।

একদিন তিনি তাঁর অমাত্যগণের কাছে তাঁরই রাজ্যের জনৈক নির্লোভ, নিস্পৃহ এবং পরোপকারী ফকিরসাহেবের কথা শুনলেন। তাঁর নাকি অনেক ক্ষমতা। তিনি প্রার্থীর প্রার্থনা অনুসারে ঈশ্বরের কাছে আরাধনা করে তার প্রার্থনা পূরণ করে থাকেন। অবশ্যই প্রার্থনা সৎ হওয়া চাই। কারো অনিষ্ট কামনা করা চলবে না।

রাজা ফকিরসাহেবের কথা শুনে মনে মনে খুবই আশান্বিত হয়ে তাঁকে সবিনয়ে ডেকে পাঠালেন নিজের প্রাসাদে।

ফকিরসাহেব এলে রাজা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করে নিজের দুঃখের কথা জানিয়ে সখেদে বললেন, 'প্রভু ! আপনি ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কেউ আমার দুঃখ দূর করতে পারবে না। আপনি আমায় দয়া করুন !'

ফকিরসাহেব রাজার কাতর প্রার্থনায় বিশেষ বিচলিত হয়ে উত্তর দিলেন; 'জাহাঁপনা ! আমি আপনার দুঃখের জন্য নিজেও খুব দুঃখিত। যাই হোক; আপনার প্রার্থনা আমি ঈশ্বরের চরণে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করব। তবে আমার একার প্রচেষ্টার চেয়ে সমবেত ভাবে প্রচেষ্টা চালালে আপনার আশা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা আরও সুদৃঢ় হবে। আপনি এক কাজ করুন। আপনার রাজ্যের প্রধান প্রধান ফকিরদের একত্র করে সেবা যত্ন তাঁদের তুষ্টি সাধনে আগে যত্নবান হোন। তাঁরা প্রীত মনে ঈশ্বরের কাছে আপনার মঙ্গল কামনা করলে আপনি নিঃসন্দেহে পুত্রবান হবেন।'

ফকিরসাহেবের নির্দেশ মত রাজা কাজ করলেন। রাজ্যের ছোট-বড় তাবৎ ফকির-সন্ত-সাধুদের ডেকে এনে তাঁদের সেবা-যত্নে মন দিলেন।

রাজার একটি পোষা প্রিয় মেষ ছিল। রাজা তাকে নিজের সন্তানের মতই ভালবাসতেন, আদর-যত্ন করতেন। এক সময়ে তিনি ভাবলেন; আমার মন যে বস্তুতে সন্তুষ্ট হয়; অপরের মনও নিশ্চয়ই সে বস্তুতে সন্তুষ্ট হবে। এই ভেবে তিনি তাঁর সেই প্রিয় মেষটিকে সাধু-সন্ত-ফকিরদের উপহার দিলেন। এমন নধরকান্তি মেষ উপহার পেয়ে তাঁরা তো খুব খুশী। সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে কেটেকুটে রান্না করে সবাই মিলে খেয়ে নিলেন। শুধু তাই-ই নয়, সেই মাংসের খানিকটা প্রসাদ হিসেবে রাজা ও রাণীকে

পাঠিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে তাঁদের পুত্র কামনা করতে করতে তাঁরা এক সময় স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

রাজা ও রাণী উভয়েই ভক্তি ভরে সেই 'মহা প্রসাদ' ভক্ষণ করে যথা সময়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন।

সেই রাত্রিতেই রাণী পুত্রবতী হলেন। দশমাস দশদিন পরে তাঁর এক দিক্‌-আলো-করা ছেলে হলো।

তাঁদের আর খুশীর সীমা রইল না।

রাজপুত্র দিন দিন শশীকলার মতন বাড়ছেন। রাজা ও রাণী ছেলেকে নিয়ে আনন্দেই আছেন। হঠাৎ রাজার কী খেয়াল হলো, দেশের সেই সব প্রধান প্রধান সাধু-সন্ত্‌-ফকিরদের আমার প্রাসাদে জড়ো করে; বিবিধ প্রকারে তাঁদের মনোরঞ্জন করে এবার তাঁদের ভোজনের জন্য নিজের প্রিয় ও পালিত সুন্দর আর তেজস্বী একটি অশ্ব উপহার দিলেন।

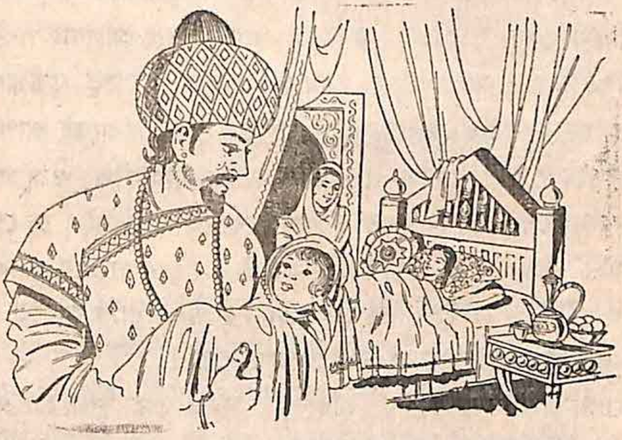
আগের মতই সাধুরা ঐ অশ্বমাংস নিজেরা খেয়ে খানিকটা প্রসাদ হিসেবে পাঠালেন রাজা ও রাণীকে। রাজা ও রাণী সেই প্রসাদ খেয়ে শয়নকক্ষে শয়ন করলেন। আগের মতই এবারও রাণী গর্ভবতী হলেন ও যথা সময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন।

মেজ রাজকুমার কালে কালে তাঁর জ্যেষ্ঠের মতই রূপ-গুণে ভূষিত হলেন। তিনি উপরন্তু বীর ও তেজস্বী হয়ে উঠলেন।

বার বার দু'বার সন্তান লাভ করে রাজার মনে লোভ জন্মাল। তিনি আর একটি সন্তান লাভের আশায় সাধু-সন্ত্‌-ফকিরদের

ডেকে আদর-যত্ন করে; এবার একটি অশ্বতর উপহার দিলেন তাঁদের খেতে। এই অশ্বতরটি বড়ই দুর্বিনীত ছিল। রক্ষকের কথা বিশেষ শুনত না।

সাধুরা খেলেন। যথারীতি প্রসাদও পাঠালেন। সেই রাত্রেই রাণী আবার সন্তানবতী হলেন। এবং সময় কালে একটি পুত্রের জন্মও দিলেন।



কনিষ্ঠ রাজকুমার রূপে তাঁর দাদাদের মতই হলেন বটে তবে গুণের দিক দিয়ে খুবই ঘাটতি রয়ে গেল। তাঁর যত বয়স বাড়তে লাগল তিনি ক্রমশঃই দুর্বিনীত, ক্রোধী, অবাধ্য নিষ্ঠুর ইত্যাদি হয়ে উঠলেন। স্বয়ং রাজা এবং রাণীও তাঁকে বশীভূত করতে পারলেন না।

পুত্রের বদগুণ দেখে রাজা মনে মনে খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। পুত্রকে সৎ পথের পথিক করার সব আশা, সব প্রচেষ্টাই তাঁর যখন বিফল হলো তখন তিনি একদিন সেই সাধু ব্যক্তিদের আবার

আহ্বান জানালেন নিজের পুরীতে এবং এই বৈষম্যের কারণ কি জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রত্যুত্তরে তাঁরা তাঁকে একযোগে জানালেন—'মহারাজ! বিশ্ব-বিধাতা কখনোই মানুষের অহিত কামনা করেন না। কারণ তিনি সকলেরই পিতা। মানুষ সৎ ও অসৎ হয় নিজের কৃতকর্মে। আপনি প্রথমবার আপনার প্রিয় মেষ এবং দ্বিতীয়বারে অশ্ব উপহার দিয়েছিলেন ঈশ্বরকে আমাদের মাধ্যমে তাই আপনার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র অশেষ গুণের আধার হয়েছেন। কিন্তু তৃতীয়বারে আপনার বিরক্তি উৎপাদনকারী অশ্বতর প্রদান করাতেই আপনার তৃতীয় পুত্র ঐ দুর্বৃত্ত অশ্বতরের মতই দুর্বিনীত ও দুঃশীল স্বভাব পেয়েছেন। এতে আমাদের কোনও দোষ নেই। যে যেমন দান করে তাঁকে, তিনি সেই রকমই ফল দেন দাতাকে। এখন আপনি যদি জীবনে শান্তি পেতে চান, রাজ্যময় শান্তি আনতে চান তবে ছোট কুমারকে বধ না করে উপায় নেই।

রাজা আর কি করবেন। তাঁর কাছে আগে তাঁর প্রজা। আগে তাঁর পুরবাসী ও পুরবাসিনীদের শান্তি। তবে অন্য কথা। সুতরাং তিনি সাধু-সন্ত-ফকিরদের কথা অনুযায়ী অবিচারিত মনে পুত্রকে বধ করে রাজ্যের মঙ্গল বিধান করলেন।

ফকিরের উপদেশ

অনেক কাল আগে তুরস্কদেশে এক সুলতান রাজত্ব করতেন? দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের দিকে তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। সময়ে সময়ে তিনি নিজেই বোগদাদের ভুবন বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অল-রশিদের মত ছদ্মবেশে নিজের রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন প্রজাদের সুখ-দুঃখ আর শত্রুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে স্বয়ং ওয়াকিবহাল হতে।

একদিন তিনি জনকতক অনুচরকে নিয়ে এই ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর কানে এলো—একটি লোক পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলছে ঃ 'যদি কেউ আমায় পাঁচশত দীনার দান করেন তবে আমি তাকে মহাফলপ্রদ একটি সদুপদেশ দেব—যা তাঁর জীবনে অবশ্যই উপকার আনবে। আছেন কেউ এমন মহাজন?'

লোকটার আকার প্রকার ফকিরের মত। এবং ফকিরেরা সাধারণতঃ সাধুপ্রকৃতির হন ও অনেক সময় অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। সুলতান কৌতূহলী হয়ে আগে নিজের অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করে, পরে ভীড় ঠেলে ফকিরের সামনে গিয়ে বললেন, 'ফকিরসাহেব! এই নিন পাঁচশত রৌপ্য দীনার আর আপনার মহাফলপ্রদ সদুপদেশটি আমায় দিন।'

ফকির অর্থ নিয়ে নিজের আংরাখার ভেতরে রেখে দিয়ে ছদ্মবেশী সুলতানকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর কানে কানে বললেন, 'বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরিণাম বুঝে, বিচার বিবেচনা করে তবেই কোন কাজ করেন। যে তার বিপরীত পথে চলে তার কপালে অশেষ দুঃখ ও দুর্গতি লেখা থাকে।'

উপদেশ শুনে ফিরে এসে সুলতান সেই কথাগুলি তাঁর অনুচরদের শোনালেন। তারা হো হো করে হেসে উঠল এবং পাঁচশ দীনার জলে গেল বলে আফশোস করতে লাগল। সুলতান চট্ করে বিচলিত হলেন না। বরং গম্ভীর মুখে বললেন, 'ফকির সাহেবের উপদেশ আমার আজীবন মনে থাকবে।' শুধু তা-ই নয়, তিনি প্রাসাদের প্রকাশ্য স্থানে এমন কি প্রতিটি বস্তুতে উপদেশটি লিখে, খোদাই করে এবং টাঙিয়ে রাখলেন।

তুরস্কের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বহুদিন থেকে রাজদরবারে কাজ করতেন। নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রমের গুণে তিনি সামান্য পদ থেকে উন্নতি করতে করতে অবশেষে প্রধান উজীরের পদে আসীন

হয়েছিলেন। কিন্তু আশা কুহকিনী-দুর্নিবারণী, কিছুতেই তার সন্তুষ্টি বা পরিতৃপ্তি নেই। ফলে এই আশার ছলনায় ভুলে উজীর মহাশয় স্থির করলেন, গোপনে আর কৌশলে সুলতানকে হত্যা করে সুলতানী পদটি তাঁকে দখল করতে হবে। অনেক ভাবনা-চিন্তা ও পরিকল্পনার পর তিনি একদিন তাঁর প্রিয় বন্ধু রাজ্যের প্রধান রাজ-চিকিৎসককে নিজের প্রাসাদে ডেকে এনে তাঁকেও নিজের ষড়যন্ত্রের অংশীদার করে বললেন, 'দোস্ত! আমি আমার একটি গোপন অভিসন্ধি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তোমার সাহায্য-প্রার্থী। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার কোন উপকারে আসবে না। যদি তুমি আমায় সাহায্য কর আর আমি যদি সে কাজে সফল হই তবে জেনো তোমার উচ্চমূল্যের পুরস্কার প্রাপ্তি অবধারিত।'

রাজ-চিকিৎসক কৌতুহলী হলেন।

প্রধান উজীর বলতে লাগলেন : 'দোস্ত! আমার উচ্চাশার কোন সীমা নেই। এই রাজ্যের জন্য, এই রাজ্যের রাজার জন্য আমি আমার জীবনের অনেকগুলি মূল্যবান বছর ব্যয় করেছি। আমার প্রাণপাত পরিশ্রমের বিনিময়ে এ রাজ্য উন্নতি করেছে, এ রাজ্যের রাজা উন্নতি করেছেন। কিন্তু আমি কি পেয়েছি? কয়েকটা মুদ্রা মাহিনা বেড়েছে। একটার পর একটা গালভরা শব্দের উচ্চপদে আসীন হয়েছি। তাতেই কি আমার পরিশ্রমের মূল্যায়ন হয়ে গেল? আমার উচ্চাশার পরিসমাপ্তি ঘটে গেল? না দোস্ত, না। আমি চাই প্রথমে সুলতান হতে, তারপর বাদশা হতে, তারপর তামাম দুনিয়ার মালিক হতে। আমার এই উচ্চাশার প্রথম আর প্রধান কাঁটা এই রাজ্যের বর্তমান সুলতান। আমি তাঁকেই আগে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাই। এর জন্যে তোমার সাহায্য দরকার।

তুমি সর্বাগ্রে একখানি বিষ মাখানো অস্ত্র সংগ্রহ কর। সুলতানের মহলে তোমার অবাধ গতিবিধি। প্রাসাদের সবাই, এমন কি স্বয়ং সুলতানও তোমায় অগাধ বিশ্বাস করেন—যেমন আমিও করি। তুমি যদি সুলতানের এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁকে কোতল করে আমার সিংহাসনে আসীন হওয়ার পথ সুগম আর নিষ্কণ্টক করে দিতে পার, তবে আমি আল্লার নামে শপথ করে বলছি, সিংহাসনে বসে প্রথমেই তোমায় এ রাজ্যের প্রধান উজীর করে দেব। বল, রাজী?'

রাজ-চিকিৎসক কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন প্রধান উজীরের এই প্রস্তাবে। এ যে অকল্পনীয়! অভাবনীয়!

তিনি মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। রাজী হলেও বিপদ, না হলেও বিপদ। একটু ভেবে তিনি শেষ অবধি রাজীই হয়ে গেলেন।

অতঃপর দু'জনের মধ্যে সুযোগ ও পরিকল্পনা নিয়ে বহুক্ষণ ধরে গভীর আলোচনা চলল। ষড়যন্ত্র পাকাপাকি হলে তিনি বিদায় নিলেন উজীরের বাসভবন থেকে।

যথাসময়ে সুযোগ এলো।

সুলতানের একটি ফোড়া কাটবার দরকার পড়ল হঠাৎ। তিনি রাজ-চিকিৎসককে তলব দিলেন।

তলব পেয়ে রাজ-চিকিৎসক নিজের পোশাকের ভেতরে লুকিয়ে প্রথমে বিষ মাখানো অস্ত্র, পরে কি ভেবে আর একখানি বিশুদ্ধ অস্ত্রও সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে গমন করলেন। ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ

করলেও বাহ্যিক আচরণে স্বাভাবিক থাকারই চেষ্টা করলেন।

সুলতান-সকাশে উপনীত হয়ে তিনি যথোচিত মর্যাদা সহকারে তাঁকে অভিবাদন করে অবশেষে তাঁর ফোঁড়াটি দেখতে চাইলেন। পৃষ্ঠবস্ত্র উন্মোচন করে সুলতান তাঁর প্রিয় চিকিৎসককে নিজের ফোড়াটি দেখালেন। চিকিৎসক দেখলেন সুলতানের অজ্ঞাতসারে পিছন দিক দিয়ে তাঁর পৃষ্ঠে বিষাক্ত অস্ত্র বিদ্ধ করার এ এক অভাবনীয় সুযোগ।

চিকিৎসক প্রস্তুত হলেন নিজের পৈশাচিক কাজে।

বাঁ হাতে সুলতানের কাঁধ ধরে, ডান হাতে সেই বিষাক্ত অস্ত্র যেমন তিনি বিদ্ধ করার উপক্রম করলেন সেই সময় তাঁর দৃষ্টি গেল, শোণিত ধারণের পাত্র হস্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান বালক-ভৃত্যের হস্তের পাত্রটির উপর। চিকিৎসক দেখলেন তাতে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা—'পরিণাম বুঝে কাজ করা সকলেরই উচিত।'

দেখে বৈদ্যরাজের মনে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষম ভীতিরও সঞ্চার হলো। তাঁর মসে হলো অলক্ষ্যে থেকে খোদাতালাহ্ সবই লক্ষ্য করছেন। এ বাণী তাঁরই সাবধান বাণী।

এদিকে সুলতানেরও দৃষ্টি গেল সেই সুবর্ণের পাত্রটির উপর। তিনি তার পালিশ করা চকচকে গায়ে প্রতিবিম্বিত হতে দেখলেন বৈদ্যরাজের আচরণ। তিনি দেখলেন, চিকিৎসক তাঁর পোশাকের আড়ালে তাড়াতাড়ি হাতের অস্ত্রটি লুকিয়ে ফেলে অন্য আর একটি অস্ত্র বার করছেন। তাঁর চোখ-মুখ বিবর্ণ।

সন্দেহ হলো সুলতানের। তিনি চিকিৎসককে ডেকে এনে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।
চিকিৎসক তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সুলতানের পদতলে লুটিয়ে পড়ে সব কথা তাঁকে খুলে বলে সকাতরে প্রাণভিক্ষা চাইলেন।



সুলতান তাঁর প্রিয় চিকিৎসককে চিরবিশ্বস্ত সেবকজ্ঞানে, এবং এটি তাঁর প্রথম অপরাধ ভেবে তাঁকে ক্ষমা করলেন।
তৎক্ষণাৎ সুলতানের আদেশে প্রধান উজীরকে বন্দী করার জন্য তাঁর বাড়িতে লোক ছুটল।
সুলতান অতঃপর সভায় এসে তাঁর অনুচরদের মধ্যে যারা সেদিন রাত্রে তাঁর সঙ্গে নগর-ভ্রমণে সঙ্গী হয়েছিল, তাদের ডেকে জানালেন ঃ 'তোমরা সেদিন রাস্তায় যেতে যেতে ফকিরের যে উপদেশ বাক্যকে অবজ্ঞা করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে, আমি সেই উপদেশ বাক্যকে সযত্নে নিজের প্রাসাদের বিভিন্ন বস্তুতে রক্ষা করার ব্যবস্থা আমি

করেছিলাম। তোমরা তাতেও আড়ালে উপহাস করেছিলে জানি। আজ সেই মহামূল্যবান উপদেশের ফল ফলল। আমি প্রাণে বেঁচে গেছি। সেদিন তোমাদের কথামত চললে আজ আর আমাকে জীবিত দেখতে না। কাজেই এখন নিশ্চিত বুঝতে পারছ, আমি ফকিরের সেই অমূল্য উপদেশের বিনিময়ে তাকে যে পাঁচশ রৌপ্য দীনার দিয়েছি, তা আদপেই জলে যায়নি বরং ফলশ্রুতির তুলনায় তুচ্ছই বলতে হবে। অর্ধেক রাজত্ব তার বিনিময়ে দিতে পারলেই ঠিক হত।'

অতঃপর সুলতান তাঁর প্রধান উজীরকে প্রাণদণ্ড আর রাজ-চিকিৎসককে রাজ্য থেকে নির্বাসন দিয়ে তিনি বাকি জীবন নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।



স-মা-প্ত

